প্রেম প্রদীপ

শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত

শ্রী চৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রেম প্রদীপ

পবিত্র হরি ভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্মণ্যতা,
শুষ্ক যোগ চেষ্টার নৈষ্পল্য ও ব্রাহ্মাদি
ধর্মের অপকর্ষ প্রদর্শক
উপন্যাস

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত

শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র চরণামৃত চকোর শশধর বংশাবতংস
শ্রী শ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরাধীশ বীরচন্দ্র মাণিক্য
বাহাদুর বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি শ্রী করকমলেষু।

মহারাজ!

পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার মানসে আমি এই প্রেম প্রদীপ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার সজ্জনতোষণীতে খন্ড খন্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। অধুনা তাঁহাদের ইচ্ছামতে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ ও তৎ প্রচারার্থে অসীম ব্যয়শীলতা দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে ইহাকে মহারাজের নিরন্তর হরি-সেবারত করকমলে অর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয়টি কোন সময় আপনকার বিদ্বৎসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। পণ্ডিত প্রধান শ্রীযুত রাধারমণ ঘোষ বি, এ, প্রভৃতি যে সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, সে সভায় আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের গ্রন্থ আলোচিত হইবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?

বৈষ্ণবজন দাসানুদাস
শ্রী কেদারনাথ দত্ত
কলিকাতা বিশ্ববৈষ্ণব সভার সম্পাদক

***

প্রকাশকের নিবেদন

এই পুস্তকটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্তৃক লিখিত ও রচিত, তিনি স্বয়ংই তাঁর মন্তব্যে লিখিয়াছেন---পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার মানসে আমি এই প্রেম প্রদীপ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার সজ্জন তোষণীতে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, সুতরাং এর বেশী কোন মন্তব্য এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা করতে পারি না।

আমাদের কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে ইহার যে কপি আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখিতেছি চারশত গৌরাব্দে উহা প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তবে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার উহার দ্বিতীয় সংস্করণ নাকি পাঁচশত সাত গৌরাব্দে প্রকাশ করেছে। পাঠকদের মধ্যে বিশেষ চাহিদা বিশেষ করে এই মূল্যবান পুস্তকটি খুবই প্রয়োজন জেনে আমরা এই সংস্করণ প্রকাশ করতে যত্ন লইলাম।

শ্রী ভক্তি স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজের বিশেষ প্রযত্নে এবং শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত শ্রীঅনাথ বন্ধু দাসাধিকারীর পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ইহা পুনঃ মুদ্রণ করা হইল।

এই সেবানুকুল্যের দ্বারা তিনি গুরু বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই লাভ করিবেন।

ইতি
প্রকাশক

* * *

সূচীপত্র

***

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রেম প্রদীপ

প্রথম প্রভা

একদা মধুমাসের প্রারম্ভে প্রচণ্ড কিরণ-মালী অদিতি নন্দন অস্তগত হইলে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত সাত্বতগণ শিরোমণি শ্রীহরিদাস বাবাজী স্বীয় কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তপনকুমারীর তটস্থিত বন্যপথে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রেমানন্দময় বাবাজীর কত কত অনির্বচনীয় ভাব উঠিতে লাগিল তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কোথাও বাবাজী হরিলীলা স্মারক রজঃপুঞ্জ দর্শন করত তথায় গড়াগড়ি দিয়া, হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! হে গোপীজনবল্লভ! বলিয়া উর্দ্ধস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন বাবাজীর নয়নযুগল হইতে আনন্দবারি অনবরত গলিত হইয়া গন্ডদেশের অঙ্কিত হরিনাম নিচয় ধৌত হইতে লাগিল। বাবাজীর অঙ্গ সমূদয় পুলকপূর্ণ হইয়া কদম্ব পুস্পের ন্যায় সুশোভিত হইল। হস্ত এরূপ অবশ হইল যে জপমালা আর ধৃত থাকিতে পারিল না। ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাবাজী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বরভঙ্গ, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সকল উদিত হইয়া বাবাজীকে একেবারে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নীত করিল। তখন বাবাজী এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে সময়ে হরিদাস বাবাজী এবম্বিধ বৈকুণ্ঠানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তখন কেশী-ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রেমদাস বাবাজী তথায় উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ বৈষ্ণব দর্শনে বৈষ্ণবের যে অপ্রাকৃত সখ্যভাবের উদয় হয়, তখন উভয়ের দর্শনে উভযের মুখশ্রীতে সেই ভাব নৃত্য করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি কোন প্রকার বাক্ সম্বোধন হইবার পূর্বেই নৈসর্গিক প্রেম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের পবিত্র শরীর পরস্পর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের নয়নবারিতে উভয়েই স্নাত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়েই উভয়কে দর্শন করত আনন্দময় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

প্রেমদাস কহিলেন, - বাবাজী! আপনাকে কয়েকদিন সাক্ষাৎ না করিয়া আমার

চিত্ত বিকলিত হইয়াছিল, এজন্য অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার মানসে আপনকার কুঞ্জে যাইতেছিলাম। আমি কয়েক দিবস হইল যাবট, নন্দগ্রাম প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

হরিদাস বাবাজী প্রত্যুত্তর করিলেন, বাবাজী! আপনকার দর্শন পাওয়া কি স্বল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম! আমি কয়েক দিবস শ্রী পণ্ডিত বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোবর্ধন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। অদ্য প্রাতে আসিয়াছি। আপনকার চরণ দর্শন করিয়া তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিলাম।

পণ্ডিত বাবাজীর নাম শ্রবণ করিবা মাত্র প্রেমদাস বাবাজীর ঊর্দ্ধপুন্ড্র শোভিত মুখমণ্ডল প্রেমে পরিপ্লুত হইল। যে সময়ে বাবাজী ভেকধারণ পূর্বক পণ্ডিত বাবাজীর নিকট শ্রীশ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রথমকাল স্মরণ করিয়া একটি অপূর্ব ভাব দ্বারা পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির একটি পরিচয় দিলেন। কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভূত হইয়া প্রেমদাস কহিলেন, বাবাজী! পণ্ডিত বাবাজীর বিদ্বৎ সভায় আজকাল কি কি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, আমার নিতান্ত বাসনা যে আপনকার সহিত একবার তাঁহার নিকটস্থ হই।

এই কথা শুনিবামাত্র হরিদাস বাবাজী, প্রেমদাস বাবাজীকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্বক কহিলেন, বাবাজী! পণ্ডিত বাবাজীর সমস্ত কার্যই অলৌকিক। আমি এক দিবসের জন্য নিকটস্থ হইয়া সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পবিত্র গুহায় আজকাল অনেক মহানুভব ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। বোধ করি আগামী কুম্ভক মেলা পর্যন্ত তাঁহারা অবস্থান করিবেন। প্রতিদিন তথায় নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধীয়, কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইতেছে।

এ পর্যন্ত কথিত হইলে প্রেমদাস বাবাজী সহসা কহিলেন, বাবাজী! আমরা শুনিয়াছি যে পরম ভাগবতগণ কেবল হরি রসাস্বাদনেই প্রমত্ত থাকেন, কর্ম জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হন না। তবে কেন আমাদের পরমারাধ্য পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় তদ্রূপ প্রশ্নোত্তরে সময় অতিবাহিত করেন?

হরিদাস বাবাজী কহিলেন, বাবাজী! আমারও পাষণ্ড মনে সে প্রকার সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন পণ্ডিত বাবাজীর পবিত্র সভায় ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে কৃষ্ণভক্তদিগের কর্ম-জ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা

সকল হরিকথা বিশেষ, বহির্মুখদিগের বহির্মুখ কথার ন্যায় চিত্তবিক্ষেপক নয়। বরং বৈষ্ণব সভায় ঐ সকল কথা অনবরত শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম-বন্ধ ও জ্ঞান-বন্ধ দূরীভূত হয়।

প্রেমদাস বাবাজী তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রোদন করিয়া কহিলেন, বাবাজী মহাশয়! আপনকার সিদ্ধান্ত কি অমৃত স্বরূপ! হবেই না কেন? আপনি শ্রীনবদ্বীপধামস্থ সিদ্ধ গোবর্ধন দাস বাবাজীর অতি প্রিয় শিষ্য বলিয়া মণ্ডলত্রয়ে (ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল) পরিচিত আছেন, আপনকার কৃপা হইলে কাহারইবা সংশয় থাকে। আপনকার চরণ প্রসাদে সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকশ্রীলোকনাথ ন্যায়ভূষণ নামধেয় ভট্টাচার্য মহাশয় যখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীগোবিন্দদাস ক্ষেত্রবাসী নাম গ্রহণ পূর্বক সর্বক্লেশঘ্ন বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় লইয়াছেন' তখন সংশয়নিবৃত্তি কার্যে আপনকার অসাধ্য কি আছে? চলুন অদ্যই আমরা হরিগুন গান করিতে করিতে গিরি গোবর্ধনের উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করি।

এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতেই উভয়ে নিম্নলিখিত হরিগুণ গানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গোবর্ধন প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

একবার এসো শ্রীহরি।

আমার হৃদ্‌কমলে, বামে হেলে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী। ১ ।।
এসো নিত্যধামে, বিনোদ ঠামে, লয়ে বামে কিশোরী।। ২ ।।
দেখে যুগল নয়ন, যুগল মিলন, দর্শন সফল করি । ৩ ।।
পরে শ্যাম পীতধড়া, মোহন চূড়া, নটবর বেশ ধরি।। ৪ ।।
দিলে চরণ-তরি, বংশীধারি, অকুল সাগর যাই তরি । ৫ ।।
আমার মনবাসনা, কালসোণা পুরাও হে কৃপা করি ।। ৬ ।।
আমার মৃত দেহে, মৃত রসনাও, যেন বলে হে হরি হরি ।। ৭ ।।

বাবাজীদ্বয় উক্ত গানটি গাইতে গাইতে যখন চলিতেছিলেন, তখন প্রকৃতি দেবী যেন ঐ গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া হাস্যবদনে জগতের শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বসন্তাবসান কালীয় মলয় বায়ু অত্যন্ত কোমলভাবে বহিতে লাগিল। দ্বিজরাজ কুমুদ্‌পতি অতি স্বচ্ছ কিরণচ্ছলে বাবাজীদ্বয়ের বৈষ্ণব কলেবরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলিন্দনন্দিনী যমুনাদেবী হরিগুণ গানে মোহিত হইয়া কলকল স্বরে বাবাজীদিগের গানে তাল দিতে লাগিলেন। দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ সকল

সন্‌সন্‌ শব্দে উড্ডিয়মান হইয়া হরিকীর্ত্তনের পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজীদ্বয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। হরিগুণ গানে এতদূর মত্ত হইয়াছিলেন, যে সে সুখময়ী রজনী কখন কিরূপে প্রভাতা হইল তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন তাঁহাদের নৃত্যগীত ভঙ্গ হইল, তখন বাবাজী মহাশয়েরা দেখিলেন যে অংশুমালী পূর্বদিক্ প্রফুল্ল করিয়া গোবর্ধনের এক প্রান্তে উদিত হইয়াছেন।

গোবর্ধন পর্বতের কিয়দ্দূরে প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাপ্ত করত চারিদণ্ড দিবস না হইতেই পণ্ডিত বাবাজীর গুহায় প্রবেশ করিলেন।

প্রথম প্রভা সমাপ্ত

***

দ্বিতীয় প্রভা

হরিদাস ও প্রেমদাস সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দন নির্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তাঁহাদের ললাটে দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা তাঁহাদের গলদেশে লক্ষিত হইতেছিল। দক্ষিণ করে ঝুলিকার মধ্যে হরিনামের মালা নিরন্তর নাম সংখ্যা রাখিতেছিল। কৌপীন ও বর্হির্বাস দ্বারা অধোদেশ আচ্ছাদিত, মস্তকের উপরশিখা শোভমানা, এবং সর্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত। "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" এই শব্দ যুগল তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, প্রায় দ্বিযোজন পথ চলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত বোধ হইতেছিল না। বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, গুহার দ্বারস্থিত অনেকগুলি লোককে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

পণ্ডিত বাবাজী যদিও গুহার মধ্যে ভজন করিতেন, তথাপি অন্যান্য সাধুগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য গুহার বাহিরে কয়েকখানি কুটির ও মধ্যস্থলে একটি মাধবীলতার মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাবাজীদ্বয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক দর্শন করিলেন। পণ্ডিত বাবাজী তাঁহাদিগকে

দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যান্য সাধু-সমাগম হইতেছে শ্রবণ করত বাবাজীদ্বয়কে লইয়া মণ্ডপে বসিলেন। সেইকালে বীরভূম নিবাসী জনৈক কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব, সম্মুখীন হইয়া, অনুমতি লাভ করত গীতাবলী হইতে একটি পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

(ললিত রাগেন)

নাকর্ণয়তি সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটু পঠনমপি লেশং।। ১
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং।। ২
নালোকয়মর্পিত মুরু হারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িত মনবারং।। ৩
হন্ত সনাতন গুণ মভিযান্তং।
কিমধারয়মহ মুরসিন কান্তং।। ৪

কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গায়ক বাবাজীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ক্রমশঃ অনেক সাধুগণ তথায় আসিয়া বসিতে লাগিলেন। নানাবিধ কথা হইতে লাগিল। এমত সময় হরিদাস বাবাজী কহিলেন, কৃষ্ণ সেবকেরাই ধন্য। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের মার্গ সমীচীন্। আমরা তাঁহাদের দাসানুদাস। প্রেমদাস বাবাজী ঐ কথার পোষকতা পূর্বক কহিলেন বাবাজী সত্য কহিয়াছ, শ্রীভগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে, -

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাম্যলাভহতোমুহুঃ।
মুকুন্দ সেবায়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ।।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐসকল প্রক্রিয়াক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্যন্ত না গিয়া, অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিন্তরূপে লব্ধ হয়।

পণ্ডিত বাবাজীর সভায় ঐ সময় একজন অষ্টাঙ্গ যোগী উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব বটেন, তথাপি বহুকাল প্রাণায়াম অভ্যাস করত সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ফলতঃ নবধাভক্তি অপেক্ষা তিনি অষ্টাঙ্গযোগের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। তিনি প্রেমদাস বাবাজীর কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাবাজী! যোগ শাস্ত্রকে অবহেলা করিও না। যোগীগণ চিরজীবি হইয়াও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা যেরূপ গাঢ়রূপে কৃষ্ণ ভজন করিতেন তুমি কি সেরূপ পারিবে? অতএব অর্চনমার্গ অপেক্ষা যোগ মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান।

বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ তর্ক ভালবাসেন না, তাহাতে আবার ভক্তির অঙ্গ সকলকে যোগের অঙ্গ অপেক্ষা সামান্য বলিয়া কথিত হওয়ায়, যোগী-বৈষ্ণবের কথায় কাহারও রুচি হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যোগী তাহাতে অপমানিত প্রায় হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করিলেন।

বাবাজী প্রথমে তর্কে প্রবেশ করিতে অস্বীকার হন, পরে যোগী তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিবেন, এরূপ বারম্বার বলায় বাবাজী কহিতে লাগিলেন -

সমস্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান, তাঁহাকেই জীবমাত্র উপসনা করে। জীব স্থুল বিচারে দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ রহিত আত্মার নাম শুদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মার নাম বদ্ধজীব। বদ্ধজীবই সাধক, শুদ্ধজীবের সাধনা নাই। বদ্ধ ও শুদ্ধের মূল ভেদ এই যে, শুদ্ধজীব বিশুদ্ধ আত্মধর্মে অবস্থিত, আত্মধর্ম চালনাই তাঁহার কার্য এবং নিরুপাধিক আনন্দই তাঁহার স্বভাব। বদ্ধজীব জড়ীয় সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া জড় ও আত্মধর্ম মিশ্রিত একটি ঔপাধিক ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। ঔপাধিক ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় নিরুপাধিক ধর্ম প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। বিশুদ্ধ প্রেমই আত্মার নিরুপাধিক ধর্ম। বিশুদ্ধ প্রেম লাভ ও মোক্ষ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইতে পারে না। যোগমার্গে যে মোক্ষের অনুসন্ধান আছে তাহাই ভক্তিমার্গের ফল রূপ প্রেম। অতএব উভয় সাধনেরই চরম ফল এক। এই জন্য ভক্ত-প্রধান শুকদেবকে মহাযোগী ও যোগী প্রধান মহাদেবকে পরম ভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ ও ভক্তি মার্গের প্রভেদ এই যে যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধি নিবৃত্তি পূর্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে উপাধি নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেককাল যায় এবং স্থলবিশেষে চরম ফল হইবার পূর্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র। যেস্থলে সকল কার্য্যই চরম ফলের অনুশীলন, সে স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনাই ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ যোগমার্গ অপেক্ষা সহজ ও

সর্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে সেও ঔপাধিক ফল মাত্র। তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখন কখন বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম নিয়ম সাধনকালে ধার্মিকতা রূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্র ফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ ফলসাধনে প্রবৃত্ত হন না। দ্বিতীয়তঃ আসন ও প্রাণায়াম কালে বহুক্ষণ কুম্ভক করিতে সমর্থ হইয়া দীর্ঘজীবন ও রোগশূণ্যতা লাভ করেন। তাহাতে যদি প্রেম সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘজীবন ও রোগশূণ্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ, কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়চিন্তা দূর হইয়া যায় অথচ প্রেমোদয় না হয় তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। আমি ব্রহ্ম এই বোধটি যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপন্ন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যোগের চরম উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট হইলেও পথটি অত্যন্ত কন্টকময়। ভক্তিমার্গে এরূপ কন্টক নাই। আপনি বৈষ্ণব অথচ যোগী, অতএব আপনি আমার কথা পক্ষপাত শূন্য হইয়া বুঝিতে পারিবেন।

পণ্ডিত বাবাজী বাক্য সমাপ্ত করিতে করিতেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া উত্তর করিলেন। যোগী বাবাজী বলিলেন - বাবাজী আপনকার সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার আর একটি কথা আছে তাহা বলি। আমি যোগ শিক্ষা করিবার পূর্বে শ্রবণ কীর্তনাদি নয় প্রকার ভক্তির অঙ্গ সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে কি আমার ইন্দ্রিয় চেষ্টা সকল এরূপ প্রবল ছিল যে, সকল কার্য্যেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতাম। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্মে যেরূপ শৃঙ্গার প্রেমের উপদেশ আছে, তাহাতে আমার চিত্ত নিরুপাধিক হইতে পারিত না। আমি প্রত্যাহার সাধন করিযা শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়াছি, এখন আর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে কিছুমাত্র বাসনা হয় না। আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্চনমার্গে যে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা বোধ হয় বৈষ্ণব সকলের প্রত্যাহার সাধক রূপে ভক্তিমার্গে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় যোগমার্গের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পণ্ডিত বাবাজী যোগী বাবাজীর কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে কহিতে লাগিলেন, বাবাজী! আপনি ধন্য, যেহেতু প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে

গিয়া রসতত্ত্ব বিস্মৃত হন নাই। শুষ্ক চিন্তা ও শুষ্ক অভ্যাস ক্রমে আত্মার অনেক স্থলে পতন হয়, যেহেতু আত্মা রসময়, কখনই শুষ্কতা সহ্য করিতে পারেন না। আত্মা অনুরাগী, তজ্জন্যই বদ্ধআত্মা উপযুক্ত বিষয় হইতে চ্যুত হইয়া ইতর বিষয়ে অনুরাগ করে; তজ্জন্যই আত্মতর্পণ সুদূরবর্ত্তী হওয়ায় ইন্দ্রিয় তর্পণই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র আত্মা যখন স্বীয় উপযুক্ত রস দর্শন করে, তখন তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ রতির উদয় হয়, জড়ীয় রতি সুতরাং খর্ব হইয়া থাকে। পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ, তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয় চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্বিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় আপনি যে কালে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন তখন আপনকার প্রকৃত সাধু সঙ্গ হয় নাই। তজ্জন্যই আপনি ভক্তিরস লাভ করেন নাই। ভক্তির অঙ্গ সকলকে কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শুষ্ক রূপে ও স্বার্থপরতার সহিত সাধন করিতেন, তাহাতে পরানন্দ রসের কিছুমাত্র উদয় হয় নাই। তজ্জন্যই বোধ হয় আপনকার ইন্দ্রিয় লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। সে স্থলে যোগমার্গের কিছু উপকার পাইবারই সম্ভাবনা। ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে, ভক্ত সঙ্গে ভক্তিরসাস্বাদন করাই প্রয়োজন। সমস্ত জড়ীয় বিষয় ভোগ করিয়াও ভোগের ফল যে ভোগবাঞ্ছা, তাহা উদিত হয় না। ভক্তদিগের বিষয় ভোগই বিষয়বাঞ্ছা ত্যাগের প্রধান হেতু।

এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণব যোগী কহিলেন, বাবাজী! আমার এ বিষয়ে অবগতি ছিল না। আমি সন্ধ্যাকালে আসিয়া যে কিছু সংশয় আছে তাহা নিবৃত্তি করিবার যত্ন পাইব। কলিকাতা হইতে অদ্য একটি ভদ্রলোক আসিবেন কথা আছে, আমি বিদায় হইলাম। আপনি কৃপা রাখিবেন।

যোগী বাবাজী বাহির হইয়া গেলে, বাবাজীর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত

***

তৃতীয় প্রভা

যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পথ মধ্যে সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করত জানিলেন যে বেলা প্রায় ১।। প্রহর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে নিজ কুঞ্জাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তমাল বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে

পাইলেন, তিনটি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক আসিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন? ইহাদের মধ্যেই মল্লিক মহাশয় আসিতেছেন। বাবাজী পূর্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া কুঞ্জ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনটি ভদ্রলোক যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের নিবাস কোথা? কোথায় যাইবেন? তিনজনের মধ্যে একটি বয়সে বিজ্ঞ এমন কি ৬০ বৎসর বয়ক্রম। গোঁপ ও চুল প্রায় সকলই শুভ্র হইয়াছে। গায়ে একটি মলমলের পিরাণ, পরণে ধুতি চাদর, হাতে ব্যাগ ও পায়ে চিনে বাড়ীর জুতা। অপর দুটিরই বয়স ৩০। ৩২ বৎসর হইবে, দাড়ী ছিল। নাকে চশমা, হাতে ছড়ি ও ব্যাগ। পায়ে বিলাতি জুতা। সকলেরই মাথায় ছোট ছোট ছাতি। বিজ্ঞ বাবুটি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী বাবাজীর আশ্রমে যাইব। তাঁহাকে অগ্রেই নিতাইদাস বাবাজীর দ্বারা পত্র লেখা হইয়াছে।

শুনিবামাত্র যোগী বাবাজী কহিলেন, তবে আপনি আমাকেই অণ্বেষণ করিতেছেন, আপনি কি মল্লিক মহাশয়? বাবু কহিলেন আজ্ঞা, হাঁ। বাবাজী যত্নপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন।

কুঞ্জটী অতিশয় পবিত্র। চতুর্দিকে বৃক্ষের বেড়া, মধ্যে তিন চারিখানি কুটীর। একটি ঠাকুর ঘর। বাবাজী চেলাদিগকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিয়া বাবুদিগের প্রসাদ সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবুরা মানস গঙ্গায় স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে একটি পঞ্চবটীর তলে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মল্লিক মহাশয় কহিলেন বাবাজী মহাশয়! আপনকার যশ কলিকাতায় সকলেই গান করেন। আমরা কিছু জ্ঞানোপদেশ পাইবার প্রত্যাশায় আপনকার শ্রীচরণে আসিয়াছি।

বাবাজী হর্ষচিত্তে কহিলেন, মহাশয় আপনি মহাত্মা লোক। নিত্যানন্দ দাস বাবাজী আমাকে লিখিয়াছেন, যে আপনকার ন্যায় বিদ্যানুরাগী হিন্দু কলিকাতায় পাওয়া যায় না। আপনি অনেক যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছেন।

মল্লিক বাবু কিঞ্চিৎ হাস্য সহকারে করিলেন, অদ্য আমার সুপ্রভাত। আপনকার ন্যায় যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

বলিতে বলিতে মল্লিক বাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়া কহিলেন, বাবাজী! আমার একটি অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই। বাবাজী! কলিকাতায় আজ কাল

পুরাতন ব্যবহার এতদুর লুপ্ত হইয়াছে, যে আমাদেরও গুরুজন দর্শনে দণ্ডবন্নতি ঘটিয়া উঠে না। এখন নির্জনে আপনকার চরণরেণু স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। আমার ইতিবৃত্ত এই যে প্রথম বয়সে আমি সন্দিহান ছিলাম। পরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম আমাদের ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম। কতদিন গিরজায় গিয়া উপাসনা করিতাম। পরে রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত অভিনব ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিছুদিন হইল বিলাতী ভূতবিদ্যা ও ক্লেয়ারভয়েন্স ও মেসমেরিসম্ নামক সমাধি বিশেষ অভ্যাস করি। গত বৎসর ঐ বিদ্যা উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য মাদ্রাজ দেশে মেডেম লোরেন্সের নিকট গিয়াছিলাম। তাহাতে আমি মৃত মহাত্মাদিগকে মনে করিলেই আবির্ভাব করিতে পারি। অনেক সুদূরবর্ত্তী সমাচার অতি অল্প চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি। আমার এই সমস্ত ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দ দাস বাবাজী একদিন বলিলেন বাবু! যদি গোবর্ধনস্থ যোগী বাবাজীর নিকট আপনি যাইতে পারেন, তবে অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জন করিতে পারিবেন। সেই সময় হইতে আমি হিন্দু শাস্ত্রে গাঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছি। আমি আর জীব মাংস ভক্ষণ করি না এবং সর্বদা পবিত্র থাকি। এবম্বিধ চরিত্র ক্রমে আমার অধিকতর সামর্থ্য জন্মিয়াছে। আমি এখন অনেক হিন্দু ব্রত করিয়া থাকি। গঙ্গাজল পান করি। বিজাতীয় লোকের স্পর্শিত কোন খাদ্য দ্রব্য স্বীকার করি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করি।

আমার সহিত নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মে শ্রদ্ধা করেন, তথাপি যোগ শাস্ত্রে যে কিছু সত্য আছে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। আমি ইহাঁদিগকে অনেকটা যোগ ফল দেখাইয়াছি। ইহাঁরাও এখন যেমত ইহাঁদের ধর্মাচার্য্যকে বিশ্বাস করেন আমাকেও তদ্রূপ বিশ্বাস করেন। হিন্দু তীর্থ প্রদেশে আসিতে ইহাঁদের ইচ্ছা ছিল না, কেননা এখানে আসিলে অনেক পৌত্তলিক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। অদ্য প্রসাদ পাইবার সময় নরেন বাবুর কিছু মনে কষ্ট হইতেছিল, তাহা তাঁহার মুখভঙ্গীতে বোধ হইল। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, ইহাঁরাও আমার ন্যায় অনতিবিলম্বে হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা করিবেন। আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম, আপনি আমাকে কিছু রাজযোগ শিক্ষা দিবেন।

মল্লিক বাবুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যোগী বাবাজী কিঞ্চিৎ হর্ষ ও বিষাদ যুক্ত একটি অভিনবভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ''বাবুজী! আমি উদাসীন আমার সংসারের সহিত ততদূর সম্বন্ধ নাই। কুম্ভক বলে আমি প্রায় বৎসরাবধি অনাহারে বদরিকাশ্রমের একটি পর্বত গুহায় বসিয়াছিলাম, হঠাৎ শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ

হইলে, পরমভাগবত ব্যাসকুমার আমাকে ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করেন। আমি তদবধি ব্রজবাসীদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমানে সংসারী হইয়াছি। তথাপি নিতান্ত সংসার প্রিয় লোকদিগের সহিত বাস করি না। আপনকার পরিচ্ছদ, আহার ও সঙ্গ ও পর্য্যন্ত নিতান্ত ভ্রষ্ট হইব।"

বাবাজীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লিক বাবু কহিলেন, আমি আপনকার আদেশানুরূপ বেশ ও আহারাদি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয়কে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? আমি এইরূপ যুক্তি করিতেছি, নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু দুই একদিন এখানে থাকিয়া বৃন্দাবনে বঙ্গীয় সমাজে গমন করুন, আমি আপনকার চরণে ছয়মাস থাকিয়া যোগভ্যাস করিব।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ঐ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে দুই দিবসের মধ্যে আমরা বৃন্দাবনে যাইব, তথায় ভৃত্য সকল আমাদের অপেক্ষায় আছে। এই কথাই অবশেষে স্থির হইল।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু প্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে গেলেন। মল্লিক বাবু বাবাজীকে একক দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী! উহাঁদিগকে আনা আমার ভাল হয় নাই, যেহেতু উহাঁদের পরিচ্ছদ দেখিলে সকলেই অবহেলা করেন। আপনি যদি কৃপা করেন তবে আমি শীঘ্রই অনার্য্য সংসর্গ সমুদায় পরিত্যাগ করিব।

বাবাজী কহিলেন, অনেক বৈষ্ণব পরিচ্ছদ ও সংসর্গ দেখিয়াই সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমার সেরূপ রীতি নয় আমি যবনাদির সহিত একত্র অবস্থান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হই না। বৈষ্ণবদিগের জাতি বিদ্বেষ নাই, তথাপি সুবিধার জন্য বৈষ্ণব পরিচ্ছদ ও ব্যবহার স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধহয়।

এক দিবসের উপদেশে কখনই কেহ বৈষ্ণববেশ স্বীকার করে না, তথাপি পূর্ব সংস্কার ক্রমেই হউক অথবা যোগী বাবাজীর শ্রদ্ধা সংগ্রহের জন্যই হউক মল্লিক বাবু তৎক্ষণাৎ ৫ টাকার চর্মপাদুকা যুগল পরিত্যাগ করিলেন। গলদেশে তুলসী ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণকরত বাবাজীকে দণ্ডবৎ করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্র জপ করিতে অনুমতি করিলেন। মল্লিক মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় মল্লিক মহাশয়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এ আবার কিভাব! আমাদের এখানে থাকা কোন প্রকার ভাল বোধ হয় না। যদিও অনেক পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধান আছে বটে। তথাপি মল্লিক

বাবু অস্থির চিত্ত, আজ এ কিরূপ ধারণ করিলেন। এক দিনেই এতদূর কেন? দেখা যাউক কি হয়। আমরা পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের অবমাননা করিব না। আমরা প্রকৃতি দর্শন করিব ও মানব স্বভাব পরীক্ষা করিতে থাকিব।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু নিকটস্থ হইলেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় একুট অস্থির হইয়া কহিলেন, " নরেন! দেখ আমি কি হইয়া উঠি। আনন্দ! তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ?"

নরেন ও আনন্দ উভয়েই কহিলেন, "আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র আপনকার কোন কার্য্যে আমরা অসুখী নই।"

বাবাজী কহিলেন, "আপনারা বিদ্বান ও ধার্মিক। কিন্তু তত্ত্ব বিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছেন?"

নরেন বাবু একজন ব্রাহ্মাচার্য্য, অনেক সময় তিনি উপাচার্য্য হইয়া ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষা দিতেন। বাবাজীর প্রশ্ন শুনিবামাত্র তিনি চশমাটি নাকে দিয়া বলিতে লাগিলেনঃ--

"ভারত বহুদিন হইতে কয়েকটি দোষে দূষিত আছে। আদৌ জাতি ভেদ। মানব মাত্রই এক বিধাতার সন্তান। সকলেই ভ্রাতা। জাতি ভেদ ক্রমে ভারতবাসীরা আর উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ পতিত হইতেছে। বিশেষত ইউরোপ দেশীয় উন্নত জাতি সমূহের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিরাকার ব্রহ্মকে পরিত্যাগ পূর্বক অনেকগুলি কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা করিয়া পরমেশ্বর হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। পৌত্তলিক পূজা, নিরর্থক উপবাসাদি ব্রত ধারণ, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণজাতীর নিরর্থক সম্মান এবং অনেকগুলি কদাচারক্রমে আমাদের ভ্রাতাগণ ক্রমশঃ নিরয়গামী হইতেছেন। জন্মজন্মান্তর বিশ্বাস করত ক্ষুদ্র জন্তুগণকে জীব বলিয়া তাহাদের মাংসাদি ভোজন করিতে বিরত। তাহাতে উপযুক্ত আহার অভাবে শরীর দুর্বল ও রাজ্য-শাসনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। পতিহীনা অবলাদিগকে বৈধব্য যন্ত্রণা দ্বারা হীন স্বত্ত্বা করিতেছে। এই সমস্ত কুব্যবহার হইতে ভারত ভূমিকে উত্তোলন করিবার জন্য, দেশ হিতৈষী রাজা রামমোহন রায় যে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ বপন করেন, আজকাল সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া ফল দান করিতেছে। আমরা সেই নিরাকার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন সমস্ত ভারতবাসীগণ মোহন্ধকার হইতে উঠিয়া উপনিষৎ প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম স্বীকার করেন। বাবাজী মহাশয়! এমন দিন কবে হইবে যে আপনি ও আমরা সকলে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিব!"

নরেন বাবু গদগদভাবে বলিতে বলিতে নিস্তব্ধ হইলে, আর কেহ কিছু বলিলেন না। বাবাজী একটু স্থির হইয়া বলিলেন, ''হাঁ, সন্দেহ অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ ঈশ্বর ভাব উদিত হওয়াও ভাল। আমি বাল্মীকি মুনির আশ্রম অতিক্রম করিয়া কাণপুরে আসি। সেখানে প্রকাশ্য স্থানে একটি শ্বেত পুরুষ ঐ সমস্ত বলিতেছিল, শুনিয়াছিলাম। আর ঐ সকল বক্তৃতা কখন শুনি নাই। ভাল একটি মূল কথা জিজ্ঞাসা করি। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? কি করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায়? তিনি সন্তুষ্ট হইলেই বা জীবের কি হয়? তাঁহাকে কেন উপাসনা করেন?''

আনন্দ বাবু একজন ভদ্র বংশজাত নব্য পুরুষ। তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্ম ধর্মের মত-প্রচারক হইয়াছেন। তিনি বাবাজীর বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন '' হে মহাত্মন্ শ্রবণ করুন্। ব্রাহ্ম ধর্মের ভাণ্ডারে সকল প্রশ্নেরই উত্তর আছে। ব্রাহ্মধর্মের পুস্তক নাই বলিয়া ব্রাহ্মধর্মকে ক্ষুদ্র বোধ করিবেন না। যে সকল ধর্মে কোন বিশেষ পুস্তকের সম্মান আছে সে সকল ধর্মে অবশ্যই পুরাতন ভ্রম দৃষ্ট হয়। আপনাদের বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মধর্ম সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে একটি ক্ষেত্রস্থিত জলাশয়ের মত বোধ হয়। তাহাতে মুক্তা থাকে না মুক্তা সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আমাদের যদিও বৃহৎ পুস্তক নাই তথাপি ব্রাহ্ম ধর্ম বলিয়া যে একখানি পুস্তিকা হইয়াছে, তাহাতেই আপনকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নখদর্পণের ন্যায় লিখিত হইয়াছে।''

আনন্দ বাবু ব্যাগ খুলিয়া আপনার চশমাটি নাকে দিলেন। ব্যাগের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ। জীবের সহিত তাঁহার পিতা পুত্র সম্বন্ধ। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইলে আমরা ভূমানন্দ লাভ করি। তিনি মাতৃ স্তনে দুগ্ধ, ক্ষেত্রে শস্য ও জলাশয়ে মৎস্য আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে বাধ্য আছি। দেখুন দেখি কত অল্প অক্ষরে আমাদের ধর্মাচার্য্য আসল কথাগুলি লিখিয়াছেন। এই পাঁচটি কথা লিখিতে হইলে আপনারা একখান মহাভারত লিখিতেন। ধন্য রাজা রামমোহন রায়! তাঁহার জয় হউক! ব্রাহ্ম ধর্মের নিশান পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হউক।

বাবাজী সহাস্যবদনে আনন্দ বাবুর তীব্র নয়ন ও শ্বশ্রু দর্শন করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মঙ্গল হউক। পরাৎপর প্রভু আপনাদিগকে একবার আকর্ষণ করুন। অদ্য আপনারা আমার অতিথি হইয়াছেন, কোন বাক্যের দ্বারা আপনাদিগের উদ্বেগ

জন্মান আমার কর্ত্তব্য হয় না। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হইলে অনতিবিলম্বে সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিব।

বাবাজীর বিনয় বাক্য শ্রবণমাত্রেই নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু চশমা রাখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, যে আজ্ঞা! আপনকার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ শ্রবণ করিব।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে মল্লিক মহাশয় পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, বাবাজী মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্বক রাজযোগ ব্যাখ্যা করুন।

যোগী বাবাজী তথাস্তু বলিয়া আরম্ভ করিলেন --

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন তাহার নাম রাজযোগ। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার নাম হঠযোগ। হঠযোগে আমার অধিক রুচি নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। শাক্ত ও শৈব তন্ত্র সকলে এবং সকল তন্ত্র হইতে যে সকল হঠযোগ দিপীকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইয়াছে ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে শিব সংহিতা ও ঘেরণ্ড সংহিতা গ্রন্থদ্বয় আমার বিবেচনায় সর্বোৎকৃষ্ট। কাশী ধামে অবস্থান কালে আমি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া হঠযোগীদের ন্যায় কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে দেখিলাম যে ঐ যোগ মার্গে কেবল শারীরিক সামান্য ফলের উদয় হয়। সমাধি তাহাতে সহজ নয়। সংক্ষেপতঃ হঠয়োগের তত্ত্ব এই।

১) সুকৃত দুষ্কৃত কর্মদ্বারা জীবের শরীর-রূপ ঘট উৎপন্ন হইয়াছে। ঘটস্থ জীবের কর্মবশে জন্ম মৃত্যু হয়।

২) ঐ ঘট আমকুণ্ড স্বরূপ অর্থাৎ দগ্ধীভূত হইয়া পক্ব হয় নাই। সংসার সমুদ্রে সর্বদা বিপদপ্রবণ আছে। হঠযোগ দ্বারা ঐ ঘট দগ্ধ হইয়া শোধিত হয়।

৩) ঘট শোধন, সপ্তবিধ। ১। শোধন, ২। দৃঢ়করণ, ৩। স্থিরীকরণ, ৪। ধৈর্য্য, ৫। লাঘব, ৬। প্রত্যক্ষ, ৭। নির্লিপ্তী করণ।

৪) ষট্‌কর্ম দ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দৃঢ়করণ, মুদ্রাদ্বারা স্থিতীকরণ প্রত্যাহার দ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব, ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং সমাধি দ্বারা নির্লেপ সাধিত হয়।

৫) ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম দ্বারা ঘট শোধিত হয়।

৬) ধৌতি চারি প্রকার অর্থাৎ অন্তর্ধৌতি, দণ্ডধৌতি, হৃদ্ধৌতি এবং মলধৌতি।

বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিস্কৃতি এই চারি প্রকার অন্তর্ধৌতি। ৬ ক)

দন্ত মূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্দ্রদ্বয় ও কপালরন্দ্রদ্বয় এই পাঁচটি ধৌতির নাম দণ্ডধৌতি। ৬ খ।

দণ্ডদ্বারা, বমন দ্বারা ও বস্ত্রদ্বারা তিন প্রকার হৃদ্ধৌতি। ৬ গ।

দণ্ড, অঙ্গুলি ও জল দ্বারা মল শোধন করিবে। ৬ ঘ।

৭) বস্তি দুই প্রকার, ১। জলবস্তি, ২। শুষ্কবস্তি। নাভিলগ্ন জলে বসিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা জলবস্তি হয়।

৮) এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র নাক দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখের দ্বারা বাহির করার নাম নেতি।

৯) অমন্দ বেগে মস্তককে উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করানর নাম লৌলিকী।

১০) নিমীলন ও উন্মীলন ত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য নিরীক্ষণ করার নাম ত্রাটক।

১১) অব্যুৎক্রম, ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম দ্বারা তিন প্রকার ভাল ভাতি সাধিত হয়।

১২) আসন দ্বাত্রিংশত প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘটশোধিত হইলেই তাহার দৃঢ়ীকরণের জন্য আসনের ব্যবস্থা। ইহাই হঠযোগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যাগ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তনাসন, উৎকটাসন, শকটাসন, ময়ুরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্মাসন, উত্তান কূর্মাসন, মণ্ডুকাসন, উত্তনামণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন। কোন একটি আসন অভ্যাস করিলেই হয়।

১৩) আসন অভ্যাস দ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে মুদ্রাসাধন দ্বারা উহা স্থিরীকৃত হয়। অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা সর্বত্র উপদিষ্ট আছে। যথা মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্দর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ খেচরী বিপরীতকরণী, যোনিমুদ্রা, বজ্রনি, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডুকী শাম্ভবী, অধোধারণা, উন্মনী, বৈশ্বানরী, বায়বী, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী।

একটি একটি মুদ্রার একটি একটি বিশেষ ফল আছে।

১৪) মুদ্রার দ্বারা ঘট স্থিরীকৃত হইলে প্রত্যাহার দ্বারা ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত স্বস্থ করার নাম প্রত্যাহার।

১৫) প্রত্যাহার দ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা শরীরকে লাঘব করিতে হয়, প্রাণায়াম করিতে হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আছে। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি আছে। কার্য্যারম্ভ কালে সে সকল বিষয় জানিবেন। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধির আবশ্যক। নাড়ী শুদ্ধির পর কুম্ভক করিতে হয়। নাড়ী শুদ্ধি কার্য্যে প্রায় তিন মাস লাগে। কুম্ভক অষ্ট প্রকার অর্থাৎ সহিত, সূর্য্যভেদী, উদ্বায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপ অঙ্গত্রয় নিয়মিত রূপে সাধিত হইলে শেষে কেবল কুম্ভক হইতে পারে।

১৬) প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব হইলে সাধক ধ্যান, পরে ধারণা ও অবশেষে সমাধি করিতে পারেন। ইহার বিশেষ বিবরণ কার্য্যকালে উপদেশ করিব।

এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে। তাহা ফল দৃষ্টে বিশ্বাস করা যায়। তান্ত্রিকেরা যোগাঙ্গ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা নিরুত্তর তন্ত্রে, চতুর্থ পটলে, ঃ-

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তিষট্ ।।

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি যোগের অঙ্গ। এবম্বিধ দত্তাত্রেয়াদির মত ভিন্ন প্রকার হইলেও হঠযোগ প্রায় সর্বমতে মূলে একপ্রকার। আমি হঠযোগ সাধন করিয়া সন্তোষ লাভ করি নাই, যেহেতু মুদ্রা সাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয়, যে সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ধৌতি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম এতদূর দুরূহ, যে সদগুরু নিকটে না থাকিলে অনেক সময় প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে। আমি কাশী হইতে বদরীনাথ গমন করিলে, একজন রাজযোগী আমাকে কৃপা করিয়া রাজযোগ শিক্ষা দেন। তদবধি আমি হঠযোগকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই কথা বলিয়া বাবাজী কহিলেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকুক, আর এক দিবস রাজযোগের বিষয় উপদেশ করিব। বেলা প্রায় অবসান হইল। একবার পূজ্যপাদ পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে যাইতে বাসনা হইতেছে।

যে সময়ে যোগী বাবাজী হঠযোগ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অনেকটা শ্রদ্ধালু হইযা তাঁহার কথা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিলেন।

শুনিতে শুনিতে বাবাজীর প্রতি তাঁহাদের একটু বিশ্বাস ও স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতি একটু তাচ্ছিল্য হইয়া উঠিল। উভয়েই বলিলেন, "বাবাজী! আপনকার সহিত তত্ত্বালোচনা করিলে বড়ই সুখী হই। অতএব এখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিব মানস করিয়াছি। আপনকার কথায় আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে।"

বাবাজী কহিলেন, " ভগবান কৃপা করিলে, অতি শীঘ্র আপনারা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত হইবেন সন্দেহ কি?"

নরেন বাবু কহিলেন, "পৌত্তলিক মত স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবেরা নিতান্ত সারহীন নহেন, বরং ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞান হইলেও পৌত্তলিক পূজা কেন পরিত্যক্ত না হয় বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণব ধর্ম অপৌত্তলিক হইলে, ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত ঐক্য হইবে, আমরাও অনায়াসে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

বাবাজী নিতান্ত গম্ভীর। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণকে কিরূপে ভক্তিপথ দেখাইতে হয় তাহা জানেন। অতএব সে সময় কহিলেন, আজ ও সকল কথা থাকুক।

মল্লিক মহাশয় বাবাজীর জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি হঠযোগের বৃত্তান্তগুলি মনে মনে স্মরণ করিয়া এই চিন্তা করিতেছিলেন। আহা! আমরা কি মূর্খ! সামান্য মেস্‌মেরিসম্, কিঞ্চিৎ হঠযোগের বৃত্তান্ত ও ভূত বিদ্যার জন্য মেডেম লোরেন্সের নিকট মাদ্রাজ গিয়াছিলাম। এতাদৃশ মহানুভব যোগীবরকে এ পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই। নিত্যানন্দ দাসের কৃপায় আমার শুভদিন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কয়েকদিন বাবাজীর সহিত তত্ত্ব বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইল, শুদ্ধ ভক্তির

তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে যে এত ভাল কথা আছে। তাহা তাঁহারা পূর্বে জানিতেন না। থিয়ডোর পার্কার যে শুদ্ধ ভক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নরেন বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর দেখিতে পাইল। আনন্দ বাবু শুদ্ধ ভক্তির বিষয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মে তাহার অধিকতর আলোচনা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যাণ্বিত হইলেন। কিন্তু উভয়েই এ বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে যাহারা এতদুর শুদ্ধ ভক্তির তত্ত্বালোচনা করিতে পারে, তাহারা কিরূপে রামকৃষ্ণাদি মানবের পূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম প্রচার করিয়া থাকে।

একদিন যোগী বাবাজী কহিলেন, চলুন পণ্ডিত বাবাজীকে দর্শন করি। বেলা অবসান হইলে সকলেই পণ্ডিত বাবাজীর গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় প্রভা সমাপ্ত

***

চতুর্থ প্রভা

বেলা প্রায় অবসান! সূর্য্য তেজ নরম পড়িয়াছে। মন্দ মন্দ পশ্চিম বায়ু বহিতেছিল। অনেকেই তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কতকগুলি যাত্রী রমণী উচ্চৈঃশ্বরে এই গানটি গাইতে গাইতে চলিতেছেন।

ত্যজ রে মন হরি বিমুখ লোক সঙ্গ।
জাক সঙ্গ হি, কুমতি, উপজতহি, ভজনহিঁ পড়ত বিভঙ্গ।।
সতত অসত পথ, লো যো যায়ত, উপযাত কামিনী সঙ্গ।
শমন দূত, পরমায়ু পরখত, দূরহিঁ নেহারত রঙ্গ।।
অতএব সে হরিনাম সার পরম মধু।
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ কহ মাধহরি চরণ সরোরুহে মাতিরহু জনু ভৃঙ্গ।।

গানটি শুনিতে শুনিতে মল্লিক মহাশয় নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর প্রতি একটু কটাক্ষ দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনে একটু বিকার উদয় হইল। নরেন বাবু রহস্য

করিয়া বলিলেন, না আজ হইতে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিন্দা করিব না। দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্মে ও বৈষ্ণব ধর্মে কিছুই ভেদ নাই কেবল পৌত্তলিকতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সে কথায় আর কেহ উত্তর করিলেন না। সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী বাবাজী কহিলেন আমরাও একটি গীত গাইতে গাইতে যাই। বাবাজী সুর ধরিয়া গান আরম্ভ করিলে সকলেই গাইতে লাগিলেন --

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপ রাশি।।
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ।।
ষড় রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব করপুরি।।
নরোত্তম দাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার।।

প্রার্থনা গান করিতে করিতে প্রায় সকলেরই নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কলিকাতায় ব্রাহ্ম নগর কীর্ত্তনে অনেকদিন নৃত্য করিয়াছিলেন, অতএব যোগী বাবাজীর সহিত ব্রাহ্মরসে নৃত্য করিতে কোন আপত্তি দেখিলেন না, কেবল যখন বাবাজী যুগল রূপরাশি বলেন তখন উহাঁরা অপরূপ রূপরাশি এই শব্দ গাইতে লাগিলেন। তাহাতে একটি অপূর্ব শোভা হইল! একজন প্রকৃত বাবাজী, একজন সংসারী বৈষ্ণব তাঁহার শিখা নাই, আর দুইদন জুতা পায় চশমা নাকে। তাঁহারা যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অনেকেই সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বাবাজী কি জগাই মাধাই উদ্ধার করিতেছেন।

কীর্ত্তনানন্দ সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে তাহাঁরা পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া পণ্ডিত বাবাজী সমস্ত বাবাজী মণ্ডলীর সহিত অগ্রসর হইয়া কীর্ত্তনের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করত ঐ কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার সময় দুই দণ্ড রাত্র হইয়াছে।

সকলে মণ্ডপে বসিলে মল্লিক মহাশয় বাবাজীদিগের চরণরেণু সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে করিতে তাহাঁর হস্তদ্বয় স্বীয় সঙ্গীদ্বয়ের দেহে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন সমস্ত সংশয় দূর হউক। তাহাঁরা উত্তর করিলেন, সকল মনুষ্যই সকলের পদরেণু লইতে পারে, কিন্তু অদ্য আমাদের হৃদয়ে একটি নবীন ভাবের উদয় হইল। যেন আমরা প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইলাম। কিন্তু ভয় হয় পাছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে

করিতে পৌত্তলিক হইয়া পড়ি। কিন্তু সত্য বলিতে কি অনেক ব্রাহ্ম-কীর্ত্তন করিয়াছি ও দেখিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব-কীর্ত্তনে যেরূপ প্রেম সেরূপ প্রেম কোথাও পাই নাই। দেখি নিরাকার হরি আমাদের শেষ কি করেন।

তাহাঁদের কথা শুনিয়া প্রেমদাস বাবাজী ও হরিদাস বাবাজী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাঁরা কোথা হইতে আসিয়াছেন ? যোগী বাবাজী তাহাঁদের সমস্ত কথা বলিলে প্রেমদাস কহিলেন, গৌরচন্দ্র আপনার দ্বারা এই দুই মহাত্মাকে আকর্ষণ করিলেন সন্দেহ নাই।

মণ্ডপে সকলেই সুখাসীন। একটি প্রদীপ এক প্রান্তে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অনেকেরই হস্তে পবিত্র ঝুলিকার ভিতর তুলসী মালা হরিনাম সংখ্যা রাখিতেছে! যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীকে বলিলেন, বাবাজী! আপনকার উপদেশ আমার হৃদয়ের অন্ধকার অনেকটা নিবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু একটি সংশয় এই যে, যদি আমরা যোগাঙ্গের প্রাণায়াম্, ধ্যান ও ধারণা স্বীকার ও অভ্যাস না করি তবে কিরূপে আমরা রস-সমাধি লাভ করিতে পারিব? সিদ্ধ বিষয়কে হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন হয়। রাগ উদ্ভাবনের সাধন কি ?

প্রশ্নটি শ্রবণ করিয়া সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে পণ্ডিত বাবাজীর গম্ভীর মুখশ্রীতে চক্ষুপাত করিলেন। মল্লিক মহাশয় একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বোধ হয় তিনি যোগী বাবাজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাহাঁর প্রশ্নে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি পণ্ডিত বাবাজীকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। তখন পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ লক্ষ্য পতিত হইল।

পণ্ডিত বাবাজী বলিতে লাগিলেন ঃ-

বদ্ধ আত্মার পক্ষে তাহাঁর স্বধর্ম রূপ বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগ কিয়ৎপরিমাণে দুঃসাধ্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই বিকৃত হইয়া জড়ীয় বিষয় রাগ রূপে পরিণত হইয়াছে। বিষয় রাগ যতদূর বর্দ্ধিত হয় বৈকুণ্ঠ-রাগ ততদূর খর্বিত হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠ-রাগ যতদূর পরিবর্দ্ধিত হয়, বিষয়-রাগ ততদূর খর্বিত হয়। ইহাই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম। বিষয়-রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয় তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়-রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না। তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্য সকল যদিও রাগোদয় ফলদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে ও বহুজন কর্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট

রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব সাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন সাধন মাত্রই কর্ম বিশেষ। মনুষ্য জীবনে যে সকল কর্ম আবশ্যক তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক, এরূপ যাঁহাদের চেষ্টা তাহাঁরা কি বৈকুণ্ঠ-রাগোদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টা সকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়-রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠচিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে। সে স্থলে যে দিকে রাগের আধিক্য সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে, কিন্তু যেস্থলে জলের রাগরূপ স্রোত তাহাকে আকর্ষণ করে সেস্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারনারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোত অবিলম্বেই তাহাঁকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব সাধন রাগমার্গ দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠ-রাগ প্রাপ্ত হন। রাগের স্রোত কাহাকে বলে ইহা জ্ঞাতব্য। বদ্ধ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ যাহা ভালবাসে এবং শরীর পোষণের জন্য যাহা যাহা প্রিয় বলিয়া বৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই মানব জীবনের বিষয়-রাগ। তন্মধ্যে বিচার ক্রমে দেখা গিয়াছে যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে পঞ্চ প্রকার রাগ আছে। চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-রাগ-ক্রমে ধাবিত হয়। জিহ্বার দ্বারা আহার, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শন, চক্ষের দ্বারা দর্শন। বদ্ধ জীবের চিত্ত অনবরতই কোন না কোন বিষয়ে সংলগ্ন আছে। বিষয় হইতে চিত্তকে কাহার বলে উঠাইতে পারা যায়? যদিও শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা তদ্বিষয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, তথাপি ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা প্রযুক্ত সাধক তদ্দ্বারা সম্যক্ বল প্রাপ্ত হন না। অতএব যোগীগণের ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অনেক ক্লেশ হয়। ভক্তিমার্গে ক্লেশ নাই। কৃষ্ণ ভক্তের জীবন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নয়। বিষয়-রাগ ও বৈকুণ্ঠ-রাগ ঐ সাধনে পৃথক্ নয়। মন চক্ষু দ্বারা বিষয় দর্শন করিতে চায়, -- উত্তম, শ্রীমূর্তির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করুক। সেখানে বিষয়ভোগ ও ব্রহ্মসম্ভোগ একই কার্য্য। শ্রবণ করিবে? কৃষ্ণ গুণ গান ও কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করুক! উপাদেয় দ্রব্য আহার করিবে? সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া প্রসাদ পাউক! ঘ্রাণার্থে অর্পিত তুলসী চন্দন প্রভৃতি আছে! এবম্ভূত সমস্ত বিষয়ই কৃষ্ণসাধকের পক্ষে ব্রহ্ম মিশ্রিত। কৃষ্ণ সাধক সর্বত্র ব্রহ্মময়। তাহাঁর সকল কার্য্যেই বৈকুণ্ঠ-রাগের অনুশীলন, তাহাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়পরতা বাধক নয় বরং প্রেমফল সাধক। আমি সংক্ষেপে রাগমার্গ ও অপর সাধন মার্গের সম্বন্ধ দেখাইলাম। আপনি মহানুভব

বৈষ্ণব, আমি আর কিছু বলিব না, নিরস্ত হইলাম। যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন।

পণ্ডিত বাবাজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। যোগী বাবাজী যদিও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি তাহাঁর বৈষ্ণব রসে সম্যক্ অধিকার ছিল। তিনি এখন নিঃসংশয় হইয়া পাণ্ডিত বাবাজীর চরণরেণু আস্বাদ লইলেন। পণ্ডিত বাবাজী তাহাঁকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। মল্লিক মহাশয় তখন কি বোধ করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কয়েকদিন হইতে শ্রীমূর্ত্তি পূজার মূল তত্ত্ব বিচার করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী তাহাঁদিগকে শ্রীচৈতন্য গীতা গ্রন্থ পড়িতে দেন, তাহা পড়িয়া এবং নানাবিধ বিচার করিয়া বিগ্রহ পূজার তাৎপর্য্য অনেকটা জানিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধা হয় নাই। পণ্ডিত বাবাজীর গম্ভীর প্রেমগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা কেবল বিদেশীয় বিদ্যায় মুগ্ধ আছি। নিজ দেশে কি কি অমূল্য রত্ন আছে তাহা জানি না! নরেন বাবু কহিলেন আনন্দ বাবু! রাজা রামমোহন রায় তবে কি বুঝিয়া শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের অবহেলা করিয়াছেন! বোধহয় তাহাঁর এ বিষয়ে কিছু ভ্রম হইয়াছিল! রাজা রামমোহন রায়ের ভ্রম? এ কথা বলিতে ভয় হয়! যে রামমোহন রায়ের কথায় আমরা ব্যাস নারদকে ভ্রমাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করি আজ কোন্ মুখে তাহাঁকে ভ্রান্ত বলিব? আনন্দ বাবু বলিলেন ভয় কি? সত্যের জন্য আমরা রামমোহন রায়কেও ত্যাগ করিতে পারি।

রাত্রি অনেক হইল। যোগী বাবাজী স্বীয় সঙ্গীত্রয় লইযা চলিলেন। পথে নিম্নলিখিত গানটি গাইতে গাইতে চারিজনে কুঞ্জে পৌঁছিলেন ঃ-

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানা জনে।।
কেহ মুক্তকচ্ছ ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি, থাকে ব্রহ্ম আরাধনে।। ১
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে।
সকলে ভজিছে সেই, একমাত্র কৃষ্ণধনে।। ২
অতএব ভ্রাতৃভাবে থাক সবে সুসদ্ভাবে।
হরি ভক্তি সাধ সদা, ও জীবনে বা মরণে।। ৩

গানের সময় আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু ''কৃষ্ণধনে'' বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া ''ভগবানে'' শব্দ ব্যবহার করিয়া সুর দিতেছিলেন, তাহা যোগী বাবাজী তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেন। কিন্তু সে রাত্রে কিছু বলিলেন না।

সকলে ভক্তিভাবে কিছু কিছু প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

চতুর্থ প্রভা সমাপ্ত

***

পঞ্চম প্রভা

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা চিন্তা ক্রমে অনেকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই। নরেন বাবু কহিলেন আনন্দ বাবু! আপনকার কিরূপ বোধ হইতেছে? আমরা চিরকাল জানিতাম যে বৈষ্ণব ধর্ম নিতান্ত হেয়। কতকগুলিন্ লম্পট, লম্পট চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা করিয়া থাকে। সে দিনেও রেবরণ্ড চার্ট সাহেব এ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের প্রধান আচার্য্য মহাশয় অনেকবার আমাদিগকে কৃষ্ণ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে বৈষ্ণবেরা ভক্তি করেন, কিন্তু স্ত্রী পুরুষের লাম্পট্যকেই তাহাঁরা ভক্তি বলেন। ভক্তি বলিয়া যে একটি বিশেষ বৃত্তি আছে তাহার কিছুমাত্র সন্ধান করেন না। কিন্তু বৈষ্ণবদের যে সকল ভাব ভঙ্গী দেখিতেছি এবং যে তত্ত্ব গর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিলাম তাহাতে উহাঁদের প্রতি আমার আর ততদূর অশ্রদ্ধা হয় না, আপনি কি বলেন?

আনন্দ বাবু কহিলেন, কি জানি কি কারণে আমার বৈষ্ণবদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হইতেছে? পণ্ডিত বাবাজী কি পবিত্র পুরুষ! তাঁহাকে দেখিলে ঈশ্বর ভক্তি উদিত হয়। তাহাঁর বাক্যগুলি অমৃত স্বরূপ। তাঁহার নম্রতা সর্বদা অনুকরণীয়। তাহাঁর পাণ্ডিত্যের সীমা নাই। দেখুন যোগী বাবাজী যোগ শাস্ত্রে কতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত। তথাপি তিনি পণ্ডিত বাবাজীর নিকট কত কথা শিক্ষা করিলেন।

নরেন বাবু কহিলেন, আমি পণ্ডিত বাবাজীর বক্তৃতায় একটি অপূর্ব কথা সংগ্রহ

করিয়াছি। বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটি পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির উদ্দীপক নিদর্শন মাত্র। কিন্তু আমার সংশয় এই যে, ঈশ্বর ভাবকে তদ্রূপ নিদর্শন দ্বারা লক্ষ্য করা উচিত কিনা? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ভূমা পুরুষ। তাহাঁকে দেশ কাল ভাবে বশীভূত করিয়া তাহাঁর আকার স্থাপন করিলে, তাহাঁর গৌরবের লাঘব করা হয় কিনা? অপিচ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়?

আনন্দ বাবু একটু অধিক বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, নরেন বাবু! আমি এরূপ সন্দেহ আর করিতে চাই না। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। সমস্তই তাহাঁর অধীন। তাহাঁর হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে এমত কিছুই নাই। তাহাঁর প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয় নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন। বিশেষতঃ সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা যন্ত্র দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতি সুক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতির দ্বারা দয়া ধর্মাদি নিরাকার বিষয় সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে পৌত্তলিক ব্যবস্থা বলিয়া ঘৃণা করা উচিত বোধ হয় না। বরং নিদর্শনের বিষয় বিবেচনায় বিশেষ আদর করা যাইতে পারে। ঘটিকা ও পুস্তককে যদি যত্ন করিয়া রাখা যায়, তবে ঈশ্বরভাবোদ্দীপক শ্রীবিগ্রহকে পূজা করিলে দোষ কি? ঈশ্বর জানেন যে তুমি তাহাঁরই উদ্দেশ করিতেছ। তিনি তাহাতে অবশ্য তুষ্ট হইবেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাবাজী ও মল্লিক মহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন। তজ্জন্যই তাহাঁরা স্পষ্টরূপে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী সর্বদাই উন্নিদ্র, অতএব ঐ সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া একটু ভঙ্গী করিয়া কহিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে অদ্য নিদ্রা যাউন। আগামী কল্য ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিব।"

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু এখন অনেকটা শ্রদ্ধালু হইয়াছেন। বাবাজীর অনুগ্রহ দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, "বাবাজী! আমরাও শ্রীযুত মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় আপনার চরণ আশ্রয় করিলাম। আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

বাবাজী কহিলেন "যথাসাধ্য কল্য যত্ন পাইব।"

কিছু কাল মধ্যে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাদের নিদ্রা দেখিয়া কি কি যোগাঙ্গ সাধন করিলেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

প্রাতে উঠিয়া বাবাজীর পঞ্চবটীর তলে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা পূর্বক সকলেই বসিলেন।

মল্লিক মহাশয় রাজযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী বলিতে লাগিলেনঃ-

''সমাধিই রাজ যোগের মূল অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা, এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়। সাধক যদি সচ্চরিত্র ধার্মিক ও শুচি মান হন, তবে প্রথমেই আসন অভ্যাস করিবেন। যদি তাঁহার চরিত্রের দোষ থাকে অথবা ম্লেচ্ছাদির ০অপবিত্র ব্যবহার তাঁহার স্বভাবে দেখা যায়, তবে যম ও নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পাতঞ্জল দর্শনই যোগ শাস্ত্র। আমি পতঞ্জলিকে অবলম্বন পূর্বক রাজ যোগের ব্যাখ্যা করিব। পতঞ্জলি কহিয়াছেন ঃ-

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার।
ধারণা ধ্যান সমাধয়োস্যৈবাঙ্গানি ।। ১ ।।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি রাজ যোগের অঙ্গ।

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাহপরিগ্রহা যমাঃ ।। ২ ।।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচটি যম। যাঁহারা হিংসা বশ তাঁহারা হিংসা পরিত্যাগের যত্ন পাইবেন। অন্য জীবকে হনন করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। যবনেরা এবং তামসিক ও রাজসিক আর্য্যগণেরাও যোগ শিক্ষা করিবার পূর্বে অহিংসা অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা মিথ্যাবাদী, তাঁহারা সত্য বচন ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা পরধন হরণ করেন, তাঁহারা অস্তেয় অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা মৈথুন প্রিয় তাঁহারা তাহা হইতে নিরস্ত হইতে অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা পরধনের আশা করেন, তাঁহারা সেই আশাকে দমন করিবেন।

শৌচ সন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানানি নিয়মাঃ ।। ৩ ।।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম। শরীর পরিষ্কার রাখিবেন। মনে সন্তোষ শিক্ষা করিবেন। সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা করিবেন। যদি অনেক পাপ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য অনুতাপ শিক্ষা করিবেন। বেদাদি

শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জন করিবেন। ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা করিবেন।

তত্রস্থির সুখমাসনং ।। ৪ ।।

যে সকল আসনের নাম আমি পূর্বে হঠযোগ বিবরণে বলিয়াছি, সেই সকল আসন রাজ যোগেও গ্রাহ্য। পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন রাজ যোগে প্রসিদ্ধ। পদ্মাসন যথা ঃ-

উর্ব্বোরুপরিবিন্যস্যসম্যক্‌পাদতলেউভে।
অঙ্গুষ্ঠৌচ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্তথা ।।

উভয় পদতল উভয় উরুর উপর সুন্দর রূপে রাখিয়া, দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই হাতে ধারণ করিবে। পুনশ্চ স্বস্তিকাসন যথা ঃ-

জানুর্ব্বোরন্তরে যোগী কৃত্ত্বাপাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষ্যতে ।।

জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পদতল রাখিয়া ঋজুকায় সমাসীন হওয়ার নাম স্বস্তিকাসন।

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়ো
র্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ।। ৫ ।।

আসন জয় হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ লক্ষণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। যে বায়ু নাশারন্ধ্র দ্বারা বাহ্যে রেচিত হয়, তাহার নাম রেচক বা শ্বাস। যে বায়ু নাশারন্ধ্রদ্বারা অন্তঃপুরে গমন করে, তাহার নাম পূরক বা প্রশ্বাস। যে বায়ু অন্তঃপুর স্তম্ভিত হয়, তাহা কুম্ভক। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়।

যম নিয়ম সিদ্ধ ব্যক্তি আসন জয় পূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

সতু বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশ কাল
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ ।। ৬ ।।

বাহ্যাভ্যন্তরে স্তম্ভ বৃত্তিরূপ সেই প্রাণায়াম কার্য্যে দেশঘটিত, কালঘটিত ও সংখ্যাঘটিত কয়েকটি বিধি আছে।

দেশ ঘটিত বিধি এই যে পবিত্র, সমান ও নির্বিরোধী স্থানে যেখানে সাধকের শরীর, মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইতে পারে, সাধক উত্তম চেলাজীন কুশোত্তর আসনে

আসীন হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। স্থানটির নিকট স্বচ্ছ জলাশয় থাকে। গৃহটী পরিষ্কার হয় এবং সেই স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। লঘু পাক আহারাদি যাহা সাধকের প্রিয়, তাহা সে স্থানে অক্লেশে পাওয়া যায়। অধিক গোলযোগ না থাকে। সরীসৃপ জন্তু ইত্যাদির ও মশকাদির উৎপাত না থাকে। স্বদেশ হইতে দূর না হয়। নিজ গৃহ না হয়। কাল ঘটিত বিধি এই যে, শীতের প্রারম্ভে বা শীতের শেষে প্রাণায়াম করিবার প্রশস্ত কাল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও অধিক রাত্রে প্রাণায়াম অভ্যাস ভাল রূপ হয়। অভুক্ত কালে বা ভোজনান্তে প্রাণায়াম করিবে না। বিশেষ লঘু ভোজন আবশ্যক। মাদক দ্রব্য এবং মাংস মৎস্যাদি নিষিদ্ধ। অম্ল, রুক্ষ্ম, লবণ, বিদাহী দব্য নিষিদ্ধ। স্বল্প মিষ্ট দ্রব্য ও স্নিগ্ধ দ্রব্য বিশেষতঃ ক্ষীরান্ন মধ্যে মধ্যে সেবনীয়। প্রাতঃ স্নানাদি এবং অধিক রাত্রে ভোজনাদি অনিয়মিত কার্য্য নিষিদ্ধ।

সংখ্যা ঘটিত বিধি। আদৌ আসীন হইয়া ষোড়শ সংখ্যা বীজ মনন পূর্বক ইড়া বা চন্দ্র নাড়িকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। সেই বায়ু চতুঃষষ্ঠি মাত্রা জপ সংখ্যা পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবেক। পরে ঐ বায়ু দ্বাত্রিংশত মাত্রা জপ সংখ্যা পর্য্যন্ত রেচন করিবে। তদনন্তর সূর্য্য নাসিকা বা পিঙ্গলা দ্বারা ষোড়শ মাত্রা পূরণ করিয়া চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভকান্তে বত্রিশ মাত্রায় ইড়া দ্বারা রেচন করিবে। পুনরায় ইড়া দ্বারা পূরণ করত কুম্ভকান্তে পিঙ্গলা দ্বারা পূর্ব মাত্রা ক্রমে রেচন করিবে। এই প্রকার তিনবার করিলে একটি মাত্রা প্রাণায়াম হয়। বাম নাসিকারন্ধ্রের নাম ইড়া বা চন্দ্র। দক্ষিণ নাসিকারন্ধ্রের নাম পিঙ্গলা বা সূর্য্য। কুম্ভক রন্ধ্রের নাম সুষুম্না। মতান্তরে প্রথমেই রেচক আরম্ভ হয়। ফল সর্বত্র একই প্রকার।

একাদি ক্রমে দ্বাদশ মাত্রা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে অধম মাত্রা সাধিত হয়। ষোড়শ মাত্রা অভ্যাস করিতে পারিলে মধ্যাম মাত্রা হয়। বিংশতি মাত্রা অভ্যস্ত হইলে উত্তম মাত্রা হয়। সকল মাত্রাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যার পর ও মধ্য রাত্রে এই পাঁচবার করিতে হয়।

তিনমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে নাড়ী শুদ্ধ হয়। নাড়ী শুদ্ধ হইলে কেবল কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের চতুর্থাঙ্গ সাধিত হয়। যথা পতঞ্জলি ঃ-

বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপীচতুর্থঃ ।। ৭ ।।

কেবল নামক চতুর্থ কুম্ভকে রেচক পূরক শূন্য প্রাণায়াম হইয়া থাকে। কুম্ভক উত্তমরূপে সাধিত হইলে দুইটি মহৎ ফল হয়। আদৌ মনের প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ধারণা কার্য্যে মনের যোগ্যতার উদয় হয়।

স্ববিষয়াসঃপ্রয়োগে চিত্তস্বরূপা
নুকার ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ ।। ৮ ।।

যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় তাহাতে সম্প্রয়োগ না করিয়া চিত্তস্থ ইন্দ্রিয় মাত্রা স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণকে অবস্থিত করার নাম প্রত্যাহার। ক্রমশঃ দর্শন বৃত্তিকে তদ্বৃত্তি রূপে চিত্তস্থ করিয়া রাখার অভ্যাস করিলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়। তদ্বৎ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিতে পারিলে ক্রমশঃ চিত্ত বৃত্তির নিরোধ ও বিষয় লালসার অভাব হয। এই প্রক্রিয়াটি কেবল সাধকেই অনুভব করিতে পারেন। ইহাকে অভ্যাস করিয়া আমার বিশেষ ফল লাভ ইহয়াছে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ।। ৯ ।।

নাভি, নাসিকা প্রভৃতি কোন কোন দেশ বিশেষ চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। ধ্যানের সাহায্য ও সমাধির উদয়ই ধারণার চরম ফল। কিন্তু ধারণা কালে অনেক অনেক বিভূতির উদয় হয়, তাহা এস্থলে বলার প্রয়োজন দেখি না। ইহাই মাত্র জ্ঞাতব্য যে যাঁহারা পরমার্থ অণ্বেষণ করেন, তাঁহারা বিভূতি অন্বেষণ করেন না। ধারণাকালে অনেক বিভূতি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন না। হঠযোগে যাহাকে মুদ্রা বলিয়াছেন, তাহাকেই দার্শনিক যোগীরা ধারণা বলেন।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানং ।। ১০ ।।

যে দেশে ধারণা সাধিত হইয়াছে, সেই দেশে জ্ঞানের একতানতার নাম ধ্যান। যথা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে সময় ধারণা সাধিত হয়। সেই ধারণায় ভগবচ্চরণের যে একতান জ্ঞান বা প্রত্যয় তাহাই ঐ চরণ ধ্যান নাম প্রাপ্ত হয়। ধারণা স্থির না হইলে ধ্যানের স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না।

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ ।। ১১ ।।

ধ্যান ও ধারণাগত অর্থ মাত্র প্রকাশ থাকে, কিন্তু স্বরূপ শূন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, এমত অবস্থার নাম সমাধি। যাঁহারা নির্বিশেষবাদী তাঁহারা সমাধি লাভ করিলে আর বিশেষ নামক ধর্মকে লক্ষ্য করেন না। হঠযোগের চরমে তদ্রূপ সমাধিই উদিত হয়। রাজযোগে সমাধি অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সে বিষয় বাক্যের দ্বারা বলা যায় না। যখন আপনি সে সমাধি লাভ করিবেন, তাহার অবস্থাও তখন সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। যাহা যাহা বলিলাম তদতিরিক্ত বাক্যের দ্বারা উপদেশ করিতে পারি না।”

যোগী বাবাজী এতাবৎ বক্তৃতা করিয়া নিরস্ত হইলেন। মল্লিক মহাশয় বক্তৃতাকালে একটু একটু সকল কথারই সংকেত লিখিয়াছিলেন। সমাধি পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইলে, তিনি বাবাজীর চরণতলে পতিত হইয়া কহিলেন প্রভো! এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া যোগাভ্যাসের শিক্ষা প্রদান করুন। আমি আপনকার শ্রীচরণে আমার জীবন বিক্রয় করিলাম।

বাবাজী মল্লিক মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দান পূর্বক কহিলেন একান্তে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। অদ্য রাত্রে আপনি যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতে পারিবেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বাবাজীর পাণ্ডিত্যে ও গাম্ভীর্য্যে ক্রমশঃ প্রীত হইয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তক নম্র করিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন।

আনন্দ বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয়! আমরা সিংহের ন্যায় আসিয়াছিলাম, এক্ষণে কুক্কুরের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। আসিবার সময় মনে করিয়াছিলাম যে, হিন্দু সমাজ পৌত্তলিক পূজা ও নিরর্থক ব্রতাদিতে ব্যস্ত হইয়া সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিয়া সেই জীবন পুনরায় অর্পণ করিব। আমাদের মনে ছিল যে বৈষ্ণবগণ তত্ত্বজ্ঞানে ক্ষমতা বিহীন হইয়া কেবল পর বাক্যে নিরর্থক সংসার বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। বৈরাগ্য গ্রহণ কেবল বৈষ্ণবী লাভের উপায় স্বরূপ। আমরা ব্রাহ্মধর্মের আলোক প্রচার করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-তমঃ দূর করিব। আপনকার শ্রীচরণে কয়েক দিবস আসিয়াছি মাত্র। কিন্তু আপনার আচার ব্যবহার, পাণ্ডিত্য ও পারমার্থিক প্রেম দৃষ্টি করিয়া, আমাদের কুসংস্কার দূর হইয়াছে। বলিতে কি এখন আমরা স্থির করিয়াছি যে, আপনকার শ্রীচরণে থাকিয়া অনেক তত্ত্ব বিষয় শিক্ষা করিব।

নরেন বাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, যদি আমাদের প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে কয়েকটি সংশয় নিরসন পূর্বক আমাদিগকে মানস ক্লেশ হইতে উদ্ধার করুন। আমি একথা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, বৈষ্ণব ধর্ম অত্যন্ত দোষহীন। যে যে বিষয়কে দোষ বলিয়া আমাদের তার্কিক অন্তঃকরণে কুতর্ক উঠিতেছে, সে সকল বাস্তবিক দোষ নয় বা ভ্রম নয়, কিন্তু কোন প্রকার ভঙ্গী বিশেষ। ভঙ্গীক্রমে কোন দূরবর্ত্তী তত্ত্ব লৌকিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার ন্যায় মহানুভব পণ্ডিতগণ যে ভ্রমের পূজা করিবেন এরূপ বোধ হয় না।

বাবাজী সহাস্য বদনে কহিলেন 'বাবুজী! আপনি সত্যের নিকটস্থ হইয়াছেন। বৈষ্ণব তত্ত্ব বাস্তবিক অপরোক্ষবাদ। যাহা হঠাৎ শুনা যায় বা দেখা যায় তাহা নয়।

বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়ক। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত ইতিহাস, বর্ণনা ও বিবরণই প্রকৃতির অতীত জগৎ সম্পর্কীয়। সেই জগৎকে সাধারণের নিকটে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বলি। সেই জগতে যে বিচিত্রতা ও বিশেষত আছে, তাহা কথায় বলা যায় না বা মনে ধ্যান করা যায় না, যেহেতু কথা ও মন সর্বদাই ভৌতিক চেষ্টায় আবদ্ধ আছে। ভৌতিক জগতে তত্ত্বদ্বিষয়ের যে সকল সদৃশ তত্ত্ব আছে, তাহাদিগকে অবলম্বন পূর্বক বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্মে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম পরম সমাধি যোগে বিবেচিত এবং পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহাতে যুক্তিবাদ হইতে উৎপন্ন ধর্ম সকল অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও গূঢ় সত্য সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুক্তি দ্বারা যে সমস্ত ধর্ম নির্ণীত হয় সে সকল ধর্ম ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সমাধি যোগে যে ধর্মের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম জানিবেন। প্রেমই বৈষ্ণব ধর্মের জীবন। প্রেম কদাপি যুক্ত্যনুগত ধর্মে সাধিত হইতে পারে না। পরম সৌভাগ্য ক্রমে আপনারা বৈষ্ণব প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছেন। অদ্য প্রসাদ সেবার পর আপনাদের সংশয় সকল শ্রবণ করিয়া যথাসাধ্য তন্নিরসনে যত্ন পাইব।

ঠাকুর ঘরে সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বাবাজী কহিলেন পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। চলুন আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি।

সকলেই উঠিয়া করযোড় পূর্বক ভগবদ্দর্শন করিতে লাগিলেন। বাবাজীর চক্ষু হইতে দরদর প্রেম বারি বহিতে লাগিল। বাবাজী এই পদটি বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"জয় রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন চন্দ্র।"

বাবাজীর নৃত্য ও প্রেম দেখিয়া মল্লিক মহাশয়ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

নরেন বাবু আনন্দ বাবুকে কহিলেন, আমরাও নৃত্য করি এখানে কেহ এমত নাই, যিনি আমাদিগকে উপহাস করিবেন। যদি অদ্য সংশয় দূর হয়, তবে আর রাধা কৃষ্ণ বলিতে লজ্জা করিব না। এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনে হাত তালি দিয়া বাবাজীর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূজারী মহাশয় চরণামৃত আনিয়া দিলে সকলেই পান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অন্ন ভোগ হইয়া গেল।

বাবাজী ও বাবুত্রয় বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ পাইলেন।

পঞ্চম প্রভা সমাপ্ত

ষষ্ঠ প্রভা

কয়েকদিবস বৃষ্টি না হওয়ায় রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হইয়াছে। প্রসাদ পাইয়া যোগী বাবাজী তাঁহাদিগকে লইয়া পঞ্চবটীর তলে বসিলেন। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। অনেক প্রকার কথা হইতে লাগিল, এমত সময় ডাকহরকরা দুইখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি পত্র নরেন বাবু গ্রহণ করিলেন। আর একখানি মল্লিক মহাশয় পড়িতে লাগিলেন।

নরেন বাবুর পত্রখানি তিনি যত্ন সহকারে সভায় পাঠ করিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ--

নরেন বাবু,

প্রায় ১০ দিবস হইল তোমার পত্র পাই নাই। পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম তোমার নিকট হইতে অনেক আশা করেন। বৃন্দাবন প্রদেশের যুবক বৃন্দের মন পৌত্তলিক ধর্মের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল কীর্ত্তনের সুরই ভাল, আর কিছু ভাল নাই। স্বল্পকালের মধ্যে যদি পার কোন নূতন সুর শিক্ষা করিয়া আসিবে, এখানে হরেন্দ্র বাবু সেই সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিতেছ, তাহার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাইবে। তোমাদের আনুকূল্য গতমাস হইতে বাকী পড়িয়াছে, অবগত করিলাম।

তোমার হৃদয় ভ্রাতা,

শ্রী ....

নরেন বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিদীষদ্ধাস্য করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন কি হয় দেখা যাউক। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্য আমার নিকট আর আশা করিতে হইবে না।

নরেন বাবুর পত্র পঠিত হইলে মল্লিক মহাশয় প্রফুল্ল বদনে তাঁহার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। আহিরীটোলা হইতে নিত্যানন্দ দাস বাবাজী লিখিয়াছেন ঃ-

সকল মঙ্গলালয়েষু,

আপনকার পারমার্থিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত আছি। গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আপনি বৈষ্ণব বেষ ধারণ করতঃ কীর্ত্তন সমাজে নৃত্য করিতেছেন। যদি তাহাই বাস্তবিক হয় তথাপি আমি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হই না, যেহেতু আপনি যোগী বাবাজীর সহিত সাধু সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্যই হরিভক্তিলতিকার বীজ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যথা কৃষ্ণ দাস বাক্যং।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।।

সেই বীজ ইত্যাদি।

যাহা হউক আপনি যোগ অভ্যাস করিতে বিশেষ উৎসুক আছেন তাহা আমি জানি। কিন্তু কেবল শুষ্ক যোগ অভ্যাস করিবেন না। বাবাজী যোগী হইয়াও পরম রসিক। তাঁহার নিকট কিছু রসতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন। যদি পারেন বাবাজীর অনুমতি লইয়া পরমারাধ্য পণ্ডিত বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনকার সঙ্গ ভাল নয়। ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমানেরা অত্যন্ত যুক্তিপ্রিয় ও তর্করত। তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিলে সরস চিত্তের রসভাণ্ডার শুষ্ক হইয়া যায়। একমাত্র পরমেশ্বরই সর্বকর্ত্তা এবং তাঁহার উপাসনা সকলেরই কর্ত্তব্য ইহা জানিলেই যথেষ্ট হয় না উপাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ উপাসনা যুক্তির অধীন। তাহাতে প্রার্থনা বন্দনাদি, কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি হইতে উদিত হয়। অন্তরঙ্গ উপাসনায় সে সকল ভাব থাকে না, কিন্তু উপাসনা কার্য্য সকল কোন অনির্বচনীয় গূঢ় আত্মরতি হইতে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

ভরসা করি কাঙ্গাল বৈষ্ণবের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত --

অকিঞ্চন
শ্রীনিত্যানন্দ দাস

নরেন বাবু বিশেষ মনযোগের সহিত ঐ পত্রখানি শুনিলেন। নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, শুষ্ক যুক্তিবাদকে ধিক্। বাবাজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সত্য। ''আনন্দ বাবু, হায়! আমরা এত দিবস নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর সহিত কেনই আলাপ করি নাই। বাবাজী মল্লিক মহাশয়ের নিকট আসিতেন আমরা কুসঙ্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিলেই চলিয়া যাইতাম। পরমেশ্বর হরি যদি আমাদিগকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া যান, তবে আমাদের অপরাধ মার্জনা যাচ্ঞা করিব।''

নরেন বাবুর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, দুইটি বাউল বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের হাতে করঙ্গ ও গোপী যন্ত্র, মুখে গোঁপ দাড়ী, চুল চুড়া করিয়া বাঁধা, পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস। বাবাজীদ্বয় এই গানটি গাইতে গাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আরে! গুরু তত্ত্ব জেনে কৃষ্ণ ধন চিন্‌লে না।
ধ্রুব প্রহ্লাদের মত এমন ভক্ত আর হবে না।।
দেখ চাতক নামে এক পক্ষ, তারা কৃষ্ণ নামে হয় দক্ষ,
কেবলমাত্র উপলক্ষ, বলে ফটিক জল দে না।
তারা নব ঘন বারি বিনে, অন্য বারি পান করে না।
দেখ সর্ব অঙ্গে ভষ্ম মাখা, আর সর্বদা শ্মশানে থাকা,
গাঁজা ভাং ধুতুরা ফাঁকা, ভাব রসে হয় মগনা।
সে যে ত্রিপুরারী, প্রেম ভিখারী, কৃষ্ণ পদ বৈ জানে না।
জাতে অতি অপকৃষ্ট, মুচিরাম দাস প্রেমীর শ্রেষ্ঠ,
মহাভাবেতে নিষ্ঠ, করে ইষ্ট সাধনা।
তার মন যে চাঙ্গা, কাটুয়ায় গঙ্গা, গঙ্গাতে গঙ্গা থাকে না।।

গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা একটু বিশ্রাম করতঃ যোগী বাবাজীর আজ্ঞা লইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন।

আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাঁরা কে?

বাবাজী বলিলেন, ইহাঁরা বাউল সম্প্রদায়ের বাবাজী ইহাঁদের মত ও আমাদের মত ভিন্ন। যদিও ইহাঁরা শ্রীচৈতন্য প্রভুর নাম করিয়া বেড়ান, তথাপি ইহাঁদিগকে আমরা বৈষ্ণব ভ্রাতা বলিব না। যেহেতু ইহাঁরা স্বকপোল কল্পিত কতকগুলি কদর্য্য মত অবলম্বন করেন, ইহাঁরা বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী।

নরেন বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী মহাশয়! বৈষ্ণব ধর্মের

কয়টি প্রধান শাখা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সকল শাখার মত এক।

বাবাজী কহিলেন, যে বৈষ্ণব ধর্মে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটি সম্প্রদায় আছে তাহাদের নাম শ্রীসম্প্রদায়, মাধ্বী সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় এবং নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়। শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী, শ্রীবিষ্ণু স্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী ঐ চারিটি মতের আদি প্রচারক। ইহাঁরা সকলেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের একই মত ঃ-

১) পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত বিধির বিধাতা।

২) পরমেশ্বরের একটি পরম সুন্দর সর্বমঙ্গলময় অপ্রাকৃত স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপ ভৌতিক জগতের সমস্ত বিধির অতীত। তাহাতে সমস্ত বিপরীত ধর্মসমূহ অপূর্বরূপে সামঞ্জস্যের সহিত ন্যস্ত আছে। বিগ্রহ হইয়াও তাহার সর্বব্যাপীত্ব আছে। সুন্দর হইয়াও ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয়। এক দেশস্থিত হইয়াও সর্বদেশে একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি করে।

৩) জড় ও জৈব জগৎ উভয়ই তাঁহার শক্তিপ্রসূত। তিনি দেশ, কাল ও বিধি সমূহের কর্ত্তা, ধাতা ও সংহর্ত্তা।

৪) জীব স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে জড়ে অনুযন্ত্রিত হইয়া জড়ে ধর্মানুগত সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তি ক্রমে জড়-মোক্ষ হইয়া থাকে।

৫) জ্ঞান বা কর্ম পথ প্রস্তরময়। ভক্তির অনুগত জ্ঞান ও কর্মে দোষ নাই। কিন্তু ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম হইতে একটি স্বাধীনতত্ত্ব।

৬) সাধুসঙ্গ ও ভক্তির আলোচনাই জীবের কর্ত্তব্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের এক মত কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবেই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মাধ্বী সম্প্রদায় মধ্যে আপনাকে গণনা করিয়াছেন। আমরা সুতরাং সকলেই মাধ্বী সম্প্রদায়ী। বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে সকল মত আছে সে সমুদায়ই অবৈষ্ণব মত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবধর্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম ঐ সকল ধর্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না।

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রবল। তথায় গোস্বামী বংশজাত মহাজনগণ যে মত প্রচার করেন, তাহাই গ্রাহ্য। বাউলদিগের মত গ্রাহ্য নয়।

এইস্থলে নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর মত কি তিনি কোন পুস্তক বিশেষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন?

বাবাজী কহিলেন, না মহাপ্রভু কোন পুস্তক লেখেন নাই। তাঁহার পার্ষদগণে যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতটি বিশুদ্ধরূপে লিখিত আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী - এই চারিজন চৈতন্য পার্ষদ মহাজন যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় মান্য।

নরেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী! তাঁহারা কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন? সেই সকল পুস্তক কোথায় পাওয়া যায়?

বাবাজী কহিলেন, তাঁহারা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, সে সকল পুস্তকের নাম বলিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। দুই একখানি গ্রন্থের নাম আমি বলিতেছি। শ্রীজীব গোস্বামী যে ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে সমুদায় ভক্তি তত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে সে সমুদায় কথাই সেই গ্রন্থে আছে। জগতের সমস্ত বিষয়েরই একটি একটি বিজ্ঞান আছে। তড়িত্তত্ত্ব, জলতত্ত্ব, ধূমতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, সংগীততত্ত্ব ও সমুদায় তত্ত্বেরই একটি একটি বিজ্ঞান আছে। ঐ বিজ্ঞান উত্তমরূপে আলোচিত না হইলে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। জগতে যত বিষয় আছে সকল বিষয় অপেক্ষা ভক্তি তত্ত্বই গুরুতর। এমত বিষয়ের যদি একটি বিজ্ঞান না হয়, তবে ভক্তি তত্ত্ব কিরূপে আলোচিত হইবে? আধুনিক ধর্ম নিচয়ে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্যবুদ্ধি হইতে সনাতন ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। উহাতে বৈষ্ণব তত্ত্ব সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্মেই কেবল ভক্তি বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। জীব গোস্বামীর সন্দর্ভে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তি বিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থ কোন কোন স্থলে ছাপা হইতেছে। আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনারা ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করেন।

নরেন বাবু কহিলেন, আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে ভক্তির বিজ্ঞান শাস্ত্র যে সকল লোকেরা জানেন না তাঁহাদের ভক্তি অতিশয় সংকীর্ণ।

বাবাজী বলিলেন, নরেন বাবু! আমি সেরূপ বলি না। ভক্তিই জীবের স্বধর্ম,

অতএব সহজ। ভক্তি কোন পুস্তক হইতে জন্ম পায় নাই। ভক্তিশাস্ত্রসকল ভক্তি হইতে জন্মিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিলেই যে ভক্তি হয়, তাহা দেখতে পাই না। বরং মুর্খ বিশ্বাস হইতে যতটা ভক্তির উদয় হয়, অনেক তর্ক দ্বারা সেরূপ হয় না। সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত নিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণ রূপ কার্য্য সমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য সুচারু রূপে হইতে পারে।

নরেন বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয়, -- আমার একটি বৃহৎ সংশয় আছে তাহা দূরীকরণ করিতে আজ্ঞা হয়। জীবের ভক্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলেই উত্তম হয়। কৃষ্ণে অর্পিত হইলে কিরূপে উত্তম হইতে পারে? কৃষ্ণ কি পরমেশ্বর? আমরা শুনিয়াছি যে কৃষ্ণ কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন বহুবিধ কার্য্য করতঃ অবশেষে একটি ব্যাধের হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। যদি তাহা হয় তবে কৃষ্ণে ভক্তি করিলে কি প্রকারে ঈশ্বরভক্তি হইবে? যে কোন মানুষকে ভক্তি করিলে কি পরমেশ্বরে ভক্তি করা হইতে পারে? আমার বিবেচনায় কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যকে ভক্তি করিলে অনেক মঙ্গল হয়, যেহেতু সাধু চরিত্র অনেক গুণে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে।

বাবাজী কহিলেন, নরেন বাবু! যদি কৃষ্ণই পরিত্যক্ত হয়, তবে বৈষ্ণব ধর্মে আর কি গৌরব থাকিল। একেশ্বরবাদ ধর্ম অনেক আছে। কিন্তু ঐ সকল ধর্মে রস নাই, যেহেতু তাহাতে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ নাই। সাধন কার্য্যে তিনটি বিষয় অর্থাৎ সাধক, সাধন ও সাধ্যবস্তু। ভক্তি সাধন কার্য্যে ভক্তির সাধক, সাধন ও সাধ্য তিনেরই যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। পরমার্থ চেষ্টায় সাধন কার্য্যের তিনটি বিভাগ আছে। কর্ম সাধন, জ্ঞান সাধন ও ভক্তি সাধন। কর্মসাধনে সাধক অত্যন্ত ফলকামী বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। ইহাতে কর্মই সাধন। নিষ্কাম বা সকাম হইয়া কর্ম করিতে হয়। ইহাতে সাধ্য পরমেশ্বর বা সর্বফলদাতা পুরুষ। জ্ঞান সাধনে সাধক চিন্তাময়, সাধনা চিন্তা ও সাধ্যব্রহ্ম অর্থাৎ দুরূহ চিন্তা লক্ষ্য বস্তু। ভক্তি সাধনে সাধক প্রীতিময় ও সাধ্যবস্তু ভগবান। যে সাধকের যে পথে রুচি সেই পথেই তাহার অধিকার। আমরা ভক্তির সাধক, অতএব পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত আমাদের কোন কার্য্য নাই। ভগবানের সহিতই আমাদের কার্য্য। ইহাতে এরূপ বুঝিবেন না যে পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান

ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব। সাধ্য বস্তু একই তত্ত্ব। কেবল সাধনা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। ইহাতে এরূপও বুঝিবেন না যে ভগবানের নানা অবস্থা আছে। ভগবতত্ত্ব একই পদার্থ ও স্বতঃ অবস্থানশূন্য। কিন্তু পরতঃ অর্থাৎ সাধকের অধিকার ভেদে ভিন্ন প্রকাশবিশিষ্ট। আপনি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিলেই এই কথাটি বুঝিতে পারিবেন।

নরেন বাবু কহিলেন, বাবাজী মহাশয়, এই কথাটি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি কিছু কিছু বুঝিতেছি বটে, কিন্তু শেষে গোলযোগ হইতেছে।

বাবাজী কহিলেন, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান ইহাঁরা একই বস্তুর ত্রিবিধ ভাবমাত্র। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কর্ত্তা, সমস্ত জীবের নিয়ন্তা, শক্তিরূপা পরাৎপর ভাবকে পরমাত্মা বলা যায়। পরমাত্মা ও পরমেশ্বর একই ভাব। জীবের উচ্চ দৃষ্টি হইলেই পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। সমস্ত জগতের অতীত কোন অনির্বচনীয় ভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্ম বিকারহীন এবং অবস্থা বিহীন। অথচ সমস্তই ব্রহ্মান্তর্গত। ইহাই জীবের দ্বিতীয় অধিকারের ভাব। জীব ও জড় হইতে পৃথক্ স্বরূপ বিশিষ্ট সর্ব শক্তিমান অচিন্ত্য কার্য্য সম্পাদক কোন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠারূপ পুরুষকে ভগবান বলা যায়। তাঁহার শক্তিই পরমাত্মারূপে জগৎ প্রবিষ্ট ও ব্রহ্মরূপে সর্বাতীত হইয়াও তিনি সর্বদা বিগ্রহবান ও লীলাবিশিষ্ট।

নরেন বাবু বিশেষ গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি আপনকার মতটি এক্ষণে উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছি। দেখিতেছি যে এটি একটি সত্য - কেবল তর্কের সন্ধান নহে। আমি অদ্য পরমানন্দ লাভ করিলাম। বৈষ্ণবতত্ত্ব বড়ই উদার। সকল সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ে করিয়া স্বয়ং অধিকতর জ্ঞানালোকে শোভা পাইতেছে।

আনন্দ বাবু কহিলেন, নরেন বাবু! বাবাজীর অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকুক। আমি তাহা কর্ণ কুহরে যত পান করিতেছি, ততই যেন কি একটা আনন্দ আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছে।

নরেন বাবু কহিলেন অদ্য হইতে পরমাত্মা ও ব্রহ্মের নিকট বিদায় লইলাম। ভগবানই আমার হৃদয়ে সর্বস্ব হইলেন। ভাল ভগবান লইয়া সন্তুষ্ট হই।

বাবাজী কহিলেন আরও কথা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে ভগবান ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়। অতএব ভগবত সাধকেরা দ্বিবিধ। কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যবান ভগবানকে ভজনা করেন, কেহ কেহ মাধুর্য্যময় ভগবানকে প্রীতি করেন। নরেন বাবু আপনি কি প্রকার সাধক হইতে ভালবাসেন।

নরেন বাবু কহিলেন আমার এস্থলে কিছু সন্দেহ আছে। ভগবানকে ঐশ্বর্য্য চ্যুত করিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিবে? কিন্তু মাধুর্য্য শব্দ শুনিলেই যেন আমার চিত্তকে পাগল করিতেছে, আমি কিছু বুঝিতে পারি না।

বাবাজী কহিলেন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য স্বভাবেই ভগবত্তা আছে। মাধুর্য্য উৎকট হইলে সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করে।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু উভয়েই কহিলেন আমরা মাধুর্য্যই ভালবাসি!

বাবাজী কহিলেন তবে তোমরা স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্ত। ভগবানের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিলেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের উদয় হয়। এ সমুদায় বিশেষরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বকলা বিশিষ্ট মাধুর্য্য চন্দ্রমা। তোমাদের হৃদপদ্মে তিনি সম্যক্ উদিত হউন।

যোগী বাবাজীর বাক্য নিস্ফল হইতে পারে না। নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু উভয় তত্ত্ব একটু গাঢ়রূপে আলোচনা করিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে আমরা কৃষ্ণদাস হইলাম। মুরলীধারী নবঘন কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে সুখাসীন হইলেন।

বাবাজী কহিলেন দেখ, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর মাধুর্য্য ভক্তের গতি কোথা? ঐশ্বর্য্যভক্তগণ কি নির্ভয়ে নারায়ণচন্দ্রের প্রতি প্রীতি চেষ্টা সমুদায় দেখাইতে পারে? ভগবান যদি কৃষ্ণ না হইতেন তবে কি আমাদের সখ্যরস, বাৎসল্য রস ও চরম রসরূপ মধুর রস আমরা তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিতাম?

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বাবাজীর চরণরেণু মস্তকে লইয়া কৃতকৃত্য হইলেন। বলিলেন অদ্য হইতে আপনি আমাদিগকে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু শিক্ষা দেন।

মল্লিক মহাশয় সঙ্গীদ্বয়ের রকম দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, মহানুভব গুরুদেবের পক্ষে ইহা কিছু অসম্ভব নয়।

বাবাজী কহিলেন তোমরা যদিও ইংরাজী বিদ্যা অনেক অর্জন করিয়াছ বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন কর নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংস্কৃত গ্রন্থ, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারিবে না। আপাততঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন কর।

বাবাজীর অনুমতি মতে বাবাজীর একজন চেলা একখানি চৈতন্য চরিতামৃত আনিয়া দিলেন। ঐ গ্রন্থ লইয়া আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু একটি কুটীরে বসিয়া গাঢ়রূপে পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন যে সন্দেহ হয় বাবাজীর নিকট বুঝিয়া

লন। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কুঞ্জের বাহিরে যাইবেন না।

আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু একটি কুটীরে বসিয়া পড়েন। দ্বিতীয় কুটীরে মল্লিক মহাশয় কুম্ভক অভ্যাস করেন। অনেক শ্রোতা আসিয়া আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুর নিকট বসিতেন। অনেকে মিলিয়া এক তানে সুর করিয়া চৈতন্য চরিতামৃত পড়িতেন, তাহা শুনিতে অত্যন্ত মধুর বোধ হইত।

এইরূপে প্রায় দশ দিবস বিগত হইলে তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ শেষ হইল। কয়েক স্থান পাঠ করিবার সময় তাঁহাদের প্রেমাশ্রু গলিত হইতেছিল। কোন কোন সময় পুলকিত অঙ্গে তাঁহারা পুস্তক রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেন।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।।
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
সংসার বাসনা ছাড়ি শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ রঘুনাথ বলে করিব আকুতি।
কবে হাম বুঝব যুগল পিরীতি।।
রূপ রঘুনাথ পদে সদা মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

অনেকগুলি বৈষ্ণব বসিয়া নরেন বাবুর সুমিষ্ট পাঠ শ্রবণ করিতেন। সনাতন ও রূপের শিক্ষা এবং রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথা আছে, তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। চৈতন্য চরিতামৃত দুইবার পঠিত হইলে ভক্তি রসামৃতসিন্ধুর পাঠ হইতে লাগিল। বাবাজী অনেকস্থলে উপদেশ দিয়া সুখী হইলেন।

একদিন নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন প্রভো! যদি কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম অর্পণ করেন তবে কৃতার্থ হই। বাবাজী বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে স্নাত ও ভক্তি দ্বারা আর্দ্র দেখিয়া তাঁহাদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিরন্তর তুলসী মালায় নাম জপ করিতে লাগিলেন।

একদিবস তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! আমরা কি তিলক মালা ধারণ করিব? তাহাতে বাবাজী কহিলেন যেমন রুচি হয় তাহা কর, আমি বাহ্য বিষয়ে কোন বিধান করি না।

যদিও বাবাজী তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন তথাপি বৈষ্ণব সংসর্গে তাঁহাদের মনে বৈষ্ণব বেষ ধারণের স্পৃহা জন্মিল। পরদিন প্রাতে মল্লিক মহাশয় - নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুকে সমাল সতিলক দেখিয়া মনে মনে বলিলেন - কৃষ্ণ কি না করিতে পারেন।

সেই দিবস অবধি আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুর দাড়ী গোঁপ দূর হইল। বিলাতি জুতা লুক্কাইত হইল। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গৃহী বৈষ্ণবের বেষ ধারণ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বৈষ্ণব কৃপা প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত গানটি করিতেছিলেন শুনিয়া বাবাজী আহ্লাদে পুলকিত হইলেন।

কবে বৈষ্ণবের দয়া আমা প্রতি হবে।
আমার বান্ধব বর্গ কৃষ্ণনাম লবে।।
শুষ্ক যুক্তিবাদ হতে হইবে উদ্ধার।
ব্রহ্ম ছাড়ি কৃষ্ণে মতি হইবে সবার।।
সকলের মুখে গুরু কৃষ্ণ নাম শুনি।
আনন্দে নাচিব আমি করে হরিধ্বনি।।
প্রভু গুরুদেব পদে প্রার্থনা আমার।
মম সঙ্গীগণে প্রভু করহ উদ্ধার।।

ষষ্ঠ প্রভা সমাপ্ত

সপ্তম প্রভা

নরেন বাবু গত রাত্রে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রাতে ডাকঘরে পাঠাইলেন। ঐ পত্রখানি প্রধান ব্রাহ্ম আচার্য্যকে লিখেন; তাহাতে ভক্তির উৎকর্ষ ও যুক্তিবাদের ধিক্কার বর্ণিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহার স্বীয় মনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়কে কয়েকটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

পত্র প্রেরিত হইবার অব্যবহিত পরেই একজন বৈষ্ণব আসিয়া প্রেমকুঞ্জের মহোৎসবে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। আনন্দ বাবু, বাবাজী, মল্লিক মহাশয় ও নরেন বাবু - সকলেই যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

বেলা দশ ঘটিকার সময়ে সকলে পূজা আহ্নিক ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রেমকুঞ্জে যাত্রা করিলেন। প্রেমকুঞ্জ অতিশয় পবিত্র স্থান। অনেকগুলি মাধবীলতার কুঞ্জ - চারিদিকে প্রাচীর। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সম্মুখেই শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় বিরাজমান। বহুতর বৈষ্ণবগণ তথায় কীর্ত্তন করিতেছেন।
অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিতে লাগিলেন। সকলেই প্রাঙ্গণে বসিয়া নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জের এক প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণবীগণের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে প্রেমভাবিনী নামা জনৈক বৈষ্ণবী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছিলেন। যদিও বৈষ্ণবীদিগের প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ছিল তথাপি পুরুষ বৈষ্ণবদিগের তথায় গমনাগমনের কোন নিষেধ ছিল না।

নরেন বাবু আনন্দ বাবুকে কহিলেন, দেখুন ব্রাহ্মগণের আশ্রম ও বৈষ্ণবদিগের আশ্রমের ভেদ কিছু দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মিকারা যেরূপ গ্রন্থ পাঠ করেন এবং গীত গান্ তদ্রূপ এখানকার বৈষ্ণবীগণেও করিতেছেন। বৈষ্ণবদিগের এবম্প্রকার ব্যবস্থা নূতন নহে, অতএব ব্রাহ্মাচার্য্যেরা বৈষ্ণব ব্যবস্থা দেখিয়াই ব্রাহ্মাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্ত্রী প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কৃষ্ণকিঙ্করীগণ সকলে ধূলির উপর উপবিষ্ট। প্রেমভাবিনী একটি ছোট আসনে তাঁহাদের মধ্যে আসীন হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদা ধুতি। ললাটে দীর্ঘ উর্দ্ধপুণ্ড্র। গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে

হরিনামের ছাপ। নিকটে একটি পঞ্চপাত্র। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী বসিয়াছেন তাঁহাদেরও সেই প্রকার বেশ এবং হস্তে হরিনামের মালা। সকলেই চাতকের ন্যায় প্রেমভাবিনীর মুখপানে চাহিয়া আছেন, প্রেমভাবিনী মধুর স্বরে পড়িতেছেন, যথাঃ-

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্ত্তন।।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়।।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর।।
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম।।

রসভাবিনী নামা একটি শ্রোতা অল্পবয়স্কা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন সখি, রতি কি বস্তু? তাহাতে পাঠকর্ত্রী কহিলেন, রতিই প্রেমের অঙ্কুর। রসভাবিনী ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; রতি কোথায় থাকে এবং রতি কাহার প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রেমভাবিনী পুরাতন বৈষ্ণবী। তিনি অনেকবার ঐ সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া সমুদায় তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রসভাবিনী প্রশ্নে গলিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারি অনবরত বহিতে লাগিল ঃ-

সখি, তোমাদের সাংসারিক বুদ্ধিতে পারমার্থিক বিষয়ে স্থান দিও না। লম্পটদিগের নিকট বিষয় ব্যবহারে যে রতির কথা শুনিয়াছ তাহা এ রতি নয়। জড়দেহেতে যে রতি আছে সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়। তোমার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী পুরুষ ব্যবহার আছে তাহা অতি তুচ্ছ, কেন না দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি - তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য দেহ আছে। সেই নিত্য দেহে সকল জীবই স্ত্রী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়দেহে চেষ্টা সকলকে ক্রমশঃ খর্বিত করিয়া নিত্যদেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য স্ত্রী দেহের অপ্রাকৃত রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা তাহাকেই রতি বলি। অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের যে স্বাভাবিক কৃষ্ণ লালসা তাহাই

জীবের নিত্য রতি। সখি, সেই রতি যদি অনুদিত থাকিত তাহা হইলে তুমি কেন সর্বস্ব, মান, সম্ভ্রম পরিত্যাগ পূর্বক ব্রজবাস স্বীকার করিবে। রতি একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহার হেতু নাই। বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি রতি প্রেমের বীজ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।

বলিতে বলিতে প্রেমভাবিনীর ভাবের উদয় হইল। তিনি অস্থিরা হইয়া, কোথা প্রাণবল্লভ! বলিয়া পড়িয়া গেলেন! সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন।

নরেন বাবু আনন্দবাবুকে বলিলেন, দেখ কি বিশুদ্ধ প্রেম। যে মূর্খগণ বৈষ্ণবগণকে স্ত্রী লম্পট বলে তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা। বৈষ্ণব প্রেম যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না।

এদিকে একটি শিঙ্গা বাজিয়া উঠিলে সকল বৈষ্ণবগণ প্রাঙ্গণে একত্রিত হইলেন। অভ্যাগত বৈষ্ণব সকল একত্রে মহোৎসবের প্রসাদ সেবায় বসিয়া গেলেন। গৃহী বৈষ্ণব সমূহ অগৃহীগণের সম্মানার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদি নামে একটি উচ্চধ্বনি উঠিল। 'প্রেম সুখে' - বলিয়া সকলে প্রসাদ সেবা আরম্ভ করিলেন। শাকান্ন ভোজন কালে একজন বৈষ্ণব দুগাছি শাক মুখে দিয়া রোদন করিয়া কহিলেন, আহা! কৃষ্ণচন্দ্র কত সুখে এই শাক ভোজন করেন। আমার এ শাকের ন্যায় মধুর দ্রব্য আর কিছুই বোধ হয় না। সকলে কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন কালে গদগদ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সুখ চিন্তা করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। সেবা সমাপ্ত হইলে প্রেম সুখে হরিধ্বনি করিয়া সকলে উঠিলেন।

মহোৎসব কর্ত্তা বৈষ্ণবদিগের পাত্রাবশিষ্ট কিছু কিছু একত্র করিয়া রাখিলেন। আনন্দ বাবু যোগী বাবাজীকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায়, বাবাজী কহিলেন ঐ একত্রিত প্রসাদের নাম 'অধরামৃত'। যিনি জাতি বুদ্ধি করিয়া ঐ অধরামৃত সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধি রহিত কপট ব্যক্তি। তাঁহাকে বৈষ্ণব মধ্যে গণনা করা যায় না। যে সকল লোকেরা জাত্যাভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল। বিশেষতঃ অভ্যাগত বৈষ্ণব সকল সর্ব জাতি পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের অধরামৃত বৈষ্ণব প্রেমের সহিত সেবন করিতে পারিলে জাতিমদ দূর হয়। জাতিমদ দূর হইলে কৃষ্ণ ভক্তি হয়।

আনন্দ বাবু, মল্লিক মহাশয় ও নরেন বাবু অতিশয় ভক্তি সহকারে অধরামৃত সেবা করিলেন। নরেন বাবু কহিলেন মানবদিগের সমতা প্রচার করিতে বৈষ্ণব

ধর্মই একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম দেখিতেছি। ব্রাহ্মেরা সমবুদ্ধির অহঙ্কার করেন বটে কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের উদারতা নাই। এখন বুঝিতেছি যে ধর্ম চিন্তায় সর্বজীবকে সমান জ্ঞান করা আবশ্যক। সাংসারিক বিষয়ে আচার ও জন্মক্রমে কিছু তারতম্য রাখা আর্য্যদিগের অভিমত। যখন দেখা যাইতেছে যে জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতি বিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন সে কেবল বৈদেশিক ভ্রমমাত্র। আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিলেন।

সকলের প্রসাদ সেবা হইয়া গেল। বৈষ্ণব সকল হরিবোল বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। কুঞ্জের অধিকারী একজন বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। তিনি অনেক স্নেহ প্রকাশ করিয়া আনন্দ বাবু, নরেন বাবু ও মল্লিক মহাশয়কে স্ত্রী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার মাতৃবৎ স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিবাস কোথা? বোধহয় কলিকাতায়, কেন না তোমাদের কথা কলিকাতার মত।

মল্লিক মহাশয়, আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু আপন আপন পরিচয় দিলেন।

নরেন বাবুর পরিচয় শুনিয়া প্রেমভাবিনী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কি চিনিতে পার?

নরেন বাবু কহিলেন না। প্রেমভাবিনী কহিলেন, বল দেখি তোমার পিসী কোথায়?

নরেন বাবু কহিলেন, আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন আমার পিসী কাশীধামে যাত্রা করেন, আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহার আকৃতি কিছু কিছু মনে পড়ে। তিনি আমাকে ডাকাতের গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইতেন।

প্রেমভাবিনী কহিলেন, আমি তোমার সেই পিসী। আমি তোমাকে ছাড়িয়া যখন কাশীধামে যাই তখন আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। কাশীতে আমি কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু কাশীর সংসর্গ ভাল নয় দেখিয়া আমি বৃন্দাবনে আসি। আজ বিশ বৎসর হইল এই কুঞ্জে বাস করিতেছি। এখানে আসা পর্য্যন্ত আমার বৈষ্ণব ধর্মে মতি হইয়াছে। আমি বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া এবং সাধুগণের উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ একান্তভাবে হরি চরণাশ্রয় করিয়াছি। এখানে আসা পর্য্যন্ত আমি আর তোমাদের সমাচার লই নাই অথবা কোন পত্র লিখি নাই। সমাচার লইতে হইলে পাছে সংসার গর্ত্তে পুনরায় পতিত হই, এই আশঙ্কায় এতাবৎ নিস্তব্ধ ছিলাম। অদ্য তোমাকে দেখা পর্য্যন্ত আমার মনে যেন এক প্রকার প্রফুল্লতা হইতেছে।

তোমার তিলক মালা দেখিয়া আমি তোমাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আম্যর পিতৃকুলের সকলেই শক্তি মন্ত্রোপাসক। তোমার কিরূপে বৈষ্ণব চিহ্ন হইল তাহা বল।

নরেন বাবু নিজ বৃত্তান্ত সমুদায় বলিলেন। প্রেমভাবিনী তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না। হে নন্দ তনয়! হে গোপীজনবল্লভ! তুমি যাহাকে কৃপা কর তাহাকে তুমি কি ছলে গ্রহণ কর তাহা কে বলিতে পারে? এই কথা বলিয়া প্রেমভাবিনী ভূমে পতিতা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে পুলক ও ঘর্ম দৃষ্টি হইল। শরীরে কি এক প্রকার কম্প হইতে লাগিল।

নরেন বাবু তখন মাতৃ স্নেহ সহকারে পিতৃস্বসাকে দুই হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহাশয় তাহা দেখিয়া বুদ্ধিহীন প্রায় হইলেন। রসভাবিনী, কৃষ্ণকাঙ্গালিনী, হরিরঙ্গিনী প্রভৃতি বৈষ্ণবীগণ তখন মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমভাবিনীর পদধূলি সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী বলিলেন প্রেমভাবিনীর জীবন সার্থক, আহা! ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম উহাতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে প্রেমভাবিনীর জ্ঞান হইল। পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রেমভাবিনী বলিতে লাগিলেন ঃ-

নরেন! তুমি যে কয়েকদিবস থাক এক একবার আমাকে দেখা দিও। তোমার গুরুদেবের চরণে তোমার ভক্তি দৃঢ় হইক। গুরুকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা হয় না। তুমি যখন বাটী যাইবে, ব্রজের কিছু রজঃ তোমার জননীর জন্য লইয়া যাইবে।

নরেন বাবু কহিলেন পিসীমা! তুমি যদি বাটী যাইতে ইচ্ছা কর আমি বিশেষ যত্ন সহকারে লইয়া যাইব।

প্রেমাভাবিনী কহিলেন বাবা! আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছি। আমার সুখাদ্য, সুবস্ত্র, সুগৃহ ও সুমিষ্ট আত্মীয়বর্গে আর স্পৃহা নাই। একান্ত চিত্তে কৃষ্ণসেবাই আমার লালসা। তুমি যদি বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় না লইতে তোমার নিকটেও আমি পরিচয় দিতাম না। কৃষ্ণভক্ত জনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্ত জনই আমার বন্ধু ভ্রাতা। কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি। আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। তোমরা ভাল থাক ও কৃষ্ণ ভজন কর।

যোগী বাবাজী এমত সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। মল্লিক মহাশয়,

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু বৃদ্ধা বৈষ্ণবী ও প্রেমভাবিনীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গেলেন।

বাবাজী কহিলেন, দিবাবসান হইতেছে চল আমরা স্বীয় কুঞ্জে গমন করি। এই বলিয়া চারিজনে চলিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে দেখিলেন একটী কদম্ব কানন। তথায় কয়েকটী ব্রজবালক বৃক্ষতলে রাখাল বেশে নৃত্য করিতেছে। নৃত্য করিতে করিতে বসন্ত রাগে নিম্নলিখিত পদটি মৃদুস্বরে গান করিতেছিল।

> অভিনব কুটল, গুচ্ছ সমুজ্জল, কুঞ্চিত কুন্তল ভার। প্রণয়ী
> জনে রত, চন্দন সহকৃত, চূর্ণিত বরঘনসার ।। ১
>
> জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার। সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবনতট
> বিহিত বসন্ত বিহার ।। ২
>
> অধর বিরাজিত, মন্দতরস্মিত, লোচিত নিজ পরিবার।
> চটুল দৃগঞ্চল, রচিত রসোচ্ছল, রাধা মদন বিকার ।। ৩
>
> ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্ত্তন, গতি বল্গিত মণিহার। নিজ
> বল্লভজন, সুহৃৎ সনাতন, চিত্ত বিহরদবতার ।। ৪

আনন্দ বাবু একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকবৃন্দ তোমরা কি করিতেছ?

বালকদের মধ্যে একজন সম্মুখে আসিয়া বলিল আমরা প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসবে মত্ত আছি।

আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কিছু পয়সা লইবে? বালকেরা উত্তর করিল শ্রীকৃষ্ণের বনবিহারে পয়সা লাগে না। কিশলয়, বেণু, শৃঙ্গ, বেত্র, গোধন ও প্রণয়ীজন ইহারাই কৃষ্ণলীলার উপকরণ। মাধুর্য্যই একমাত্র কৃষ্ণলীলার ভাব। আমরা ঐশ্বর্য্য জানি না। আমি সুবল, উনি শ্রীদাম, উনি বলদেব, এই বেত্র, ঐ শৃঙ্গ, এই কদম্ব কানন, আমরা সকলেই কৃষ্ণের প্রণয়ীজন। আমাদের কি অভাব? আপনারা প্রস্থান করুন আমাদের সেবার কাল যায়!

আনন্দ বাবু নরেন বাবু সেস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে গিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন ব্রজের ভাবের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর, এখানে সকলেই

ভাবুক এবং সমস্তই ভাবময়। বালক প্রভৃতি ত চৈতন্য বিশিষ্ট, দেখ বৃক্ষসকলও নম্র কন্দরে কৃষ্ণলীলায় মুগ্ধ হইয়াছে। পক্ষীসকল সময়ে সময়ে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছে। আহা! তার্কিকগণের পক্ষে বৃন্দাবন একটি অদ্ভুত দর্শন।

বলিতে বলিতে বাবাজীর ভাবোদয় হইতে লাগিল। হা রাধে! হা বৃন্দাবনেশ্বরী! বলিয়া বাবাজী স্পন্দহীন হইয়া উঠিলেন!

বাবাজীকে তদবস্থা দেখিয়া আনন্দ বাবু ও নরেন বাবুও একটু মত্তভাবে হরি হরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু বলিলেন কি আশ্চর্য্য! - ব্রাহ্মাচার্য্য এই সব ব্রজ বালককে পৌত্তলিক ধর্ম্মের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চান! আমি হইলে তাঁহাকে লিখিতাম, বৈদ্যরাজ, আপনার রোগ আপনি শান্তি কর।

একটু পরে সকলেই পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে যোগী বাবাজীর কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিদিন ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, তত্ত্ববিষয়ে বিচার, হরিগুণ কীর্ত্তন, তীর্থ পরিক্রমণ, মহাপ্রসাদ সেবন, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন প্রভৃতি কার্য্য হইতে লাগিল। বাবুদের বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না। কেহ তর্ক আরম্ভ করিলে তাঁহারা বলেন যে তর্কের কাল অতিবাহিত হইয়াছে, ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সাকার নিরাকার ধর্মাধর্ম লইয়া তর্ক করুন, আমরা হরিরসপানে মুগ্ধ থাকি। যেখানে অবিদ্যাই পরম সুখ সেখানে বিদ্যার মুখে শতমুখী প্রদান করি।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল।

সপ্তম প্রভা সমাপ্ত

অষ্টম প্রভা

একদিবস প্রাতে নরেন বাবু একখানি দীর্ঘ পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে আমলকী বৃক্ষের তলে বসিলেন। আনন্দ বাবু ও মল্লিক মহাশয় ও কয়েকজন বৈষ্ণব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, নরেন বাবু ও

পত্রখানি কে লিখিয়াছে। নরেন বাবু একটু শুষ্ক মুখে কহিলেন ব্রাহ্মাচার্য্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পত্র আমি অদ্যই পাইলাম। আনন্দ বাবুর প্রার্থনা মতে নরেন ঐ পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন।

ভ্রাতঃ! তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই অসুখী হইয়াছি; কি জানি কাহার কুতর্কে পড়িয়া তুমি কতকষ্টে উপার্জ্জিত জ্ঞান রত্নকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছ। তোমার কি মনে পড়ে না যে কত পরিশ্রম করিয়া আমি তোমর কুসংস্কার সমুদায় দূর করিয়াছিলাম। আবার কিজন্য সেই সকল কুসংস্কারকে বরণ করিতেছ? ব্রাহ্মপ্রধান প্রভু যিশু বলিয়াছেন যে ধর্ম সংস্কার কার্য্য, সকল কার্য্য হইতে কঠিন। কুসংস্কারও লোককে শীঘ্র পরিত্যাগ করে না, কেন না মানব জাতি সর্বদাই ভ্রম পরবেশ। পবিত্র যিশুরও ভূতবিশ্বাস ছাড়ে নাই। অতএব যতই শিক্ষা কর তোমাদেরও ভ্রম দূর হয় নাই। যদিও তোমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি আমার কর্ত্তব্য যে তোমাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করি। অতএব তোমার প্রশ্নগুলির এক একটি উত্তর দিতেছি; বিশেষ বিবেচনা পূর্বক অর্থানুসন্ধান করিবে।

তুমি লিখিয়াছ যে মানবের প্রেম বৃত্তিই ভক্তি। ভক্তি বলিয়া আর একটি বৃত্তি আছে তাহা স্বীকার কর না। আমার বিবেচনায় ভক্তি একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। মানব সকল নিতান্ত বিষয় পরবশ হওয়ায় সে বৃত্তির ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যখন পরমেশ্বরকে আমরা পিতা বলিয়া সম্বোধন করি তখন বাহ্যে পিতৃভক্তিরূপ বৃত্তিটি কার্য্য করে। অন্তরে সেই ভূমা পুরুষের প্রতি কোন অনির্বচনীয় সম্বন্ধের লক্ষণ দেখায়। যখন তাঁহাকে সখা বলি তখন সামান্য সখ্য রসের উদয় হয়; কিন্তু তাহার ভিতরে একটি পরমপুরুষগত সম্ভ্রম থাকে। ফল কথা ভক্তি বৃদ্ধির পরিচয় নাই। আমরা উদ্ধৃত হইলে তাহাকে চিনিতে পারিব।

তুমি লিখিয়াছ যে ব্রাহ্মেরা অনেক সময় পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করেন। যদি তাঁহার স্বরূপ নাই তবে সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে। নরেন এইটা কি যুক্তি? ছল করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি বিশ্বাস করিবার পথ করিতেছ। আমরা যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করি সে কেবল ভাবগত মুদ্ধতা মাত্র। ভাবচক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, বাস্তবিক ভূমা পুরুষের সৌন্দর্য্য কিরূপে সম্ভব হয়?

তুমি লিখিয়াছ সে ভাবকে যতদূর পারা যায় উন্নত করিতে হইলে যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়। একথা কাজের কথা নয়; মানব যুক্তির বলে অন্যান্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যুক্তিকে বিসর্জন দিলে পুনরায় ক্ষুদ্র জন্তুর সহিত ঐক্য হইয়া পড়ে। ভাব ততদূর বাড়ুক যতদূর বাড়িলে যুক্তির সহিত বিরোধ না করে। যেখানে

যুক্তির সহিত বিরোধ হয় সেস্থলে ভাবকে পীড়া বলিয়া জানিবে। ভক্তি করিবার সময় সর্বদা যুক্তির আশ্রয় লইবে। পরমেশ্বরকে ভাবার্পণ করাই যে চরম কার্য্য তাহা নয়। সংসারে সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করার নাম তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। বৈরাগী হইয়া ভাবাশ্রয় করিলে অবশ্য অধঃপতন হইবে। তুমি থিয়েডোর পার্কারের পুস্তকগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িয়া দেখিবে।

তুমি বলিয়াছ যে ব্রাহ্মধর্ম যুক্তিবাদ, তাহা নহে। তুমি জান যে বিলাতে একেশ্বরবাদ ধর্ম দুই প্রকার, অর্থাৎ *Deist* (যুক্তিবাদী) ও *Theist* অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিবাদী। যুক্তিবাদীদিগকে *Rationalist* বলে। তাহারা পরমেশ্বর স্বীকার করে কিন্তু উপাসনা স্বীকার করে না। ভক্তিবাদীরা উপাসনা স্বীকার করেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে একেশ্বরবাদ বলা যায় না। খ্রীষ্টিয়ানেরা পরমেশ্বর, যীশু ও ধর্মাত্মা তিনজনকে এক করিয়া মানেন। সেস্থলে তাঁহারা কিরূপে শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হইতে পারেন? মুসলমানের যীশু বা ধর্মাত্মা নাই বটে কিন্তু তাহাদের যে সয়তান আছে সেও পরমেশ্বরের সমকক্ষ। বিশেষতঃ মহম্মদকে কতকটা দেবতারূপে তাহারা স্বীকার করে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা একেশ্বরবাদী নহে, একেশ্বরবাদীরা সম্প্রদায় করেন নাই। তাঁহারা গ্রন্থ লেখক। একেশ্বর ব্রাহ্মেরাই কেবল একেশ্বরবাদীর সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন। এমত অপূর্ব সম্প্রদায় হইতে তোমার কি জন্য পৌত্তলিক গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছ বলিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিবাদ বলিলে আর কে ভক্তিবাদী হইবে? ব্রাহ্মধর্মে ভাবের স্বীকার আছে, কিন্তু ভাবকে সীমা বিশিষ্ট না করিলে ক্রমশঃ যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

নরেন তুমি ভাবুকদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। এখানে ফরেষ্ট অফিসে একটি কর্ম খালি আছে। আমি সাহেবের নিকট অনুরোধ করায় তিনি তোমাকে ঐ কর্ম দিতে স্বীকার হইয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে চলিয়া না আসিলে কর্ম পাইবে না।

তোমার হৃদয় ভ্রাতা

শ্রী ....

ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্রখানি তথায় ৪।৫ বার পঠিত হইল। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু বিশেষরূপে উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলেন। শেষে স্থির হইল যে ব্রাহ্মাচার্য্যের সমুদায় কথাই অকর্ম্মণ্য।

বাবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, জীবের ভক্তি বৃত্তি প্রেম বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। আত্মার ধর্ম্মই রাগ। সেই রাগ পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বলা যায়, জড়ীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে বিষয়াসক্ত হয়। বৃত্তি দুই নয়, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছ তাহাই সত্য। যদি কোন সংশয় থাকে তবে একবার পণ্ডিত বাবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ নিবৃত্ত কর।

ব্রাহ্মাচার্য্য আর যে যে কথা লিখিয়াছেন সে সকল স্পষ্টই সম্প্রদায় পক্ষমাত্র, ইহা নরেন বাবু নিজেই সিদ্ধান্ত করিলেন।

সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নরেন বাবু, আনন্দ বাবু, মল্লিক মহাশয় ও বাবাজী সকলে একত্রে পণ্ডিত বাবাজীর নিকট গমন করিলেন।

পণ্ডিত বাবাজীর মণ্ডপে প্রায় পঞ্চাশজন সাধু বৈষ্ণব বসিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে হরিদাস ও প্রেমদাস পণ্ডিত বাবাজীর নিকটেই ছিলেন। যোগী বাবাজী ও তৎসঙ্গীগণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া আসিতে আজ্ঞা হউক বলিলেন। তাঁহারা সচ্ছন্দে বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করত তথায় বসিলেন।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী! আপনার সঙ্গীগুলির বেশ বদল হইয়াছে দেখিতেছি। যোগী বাবাজী কহিলেন হাঁ কৃষ্ণ উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন যেন উহাঁদের কৃষ্ণ প্রেম সমৃদ্ধ হয়।

সকল বৈষ্ণব এক বাক্যে কহিলেন, অবশ্য হইবে। আপনকার কৃপা হইলে কি না হয়।

সকলে সুখাসীন হইলে যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজী বিনয় পূর্বক কহিলেন, বাবাজী! ইহাঁরা কৃষ্ণ ভক্ত হইয়াছেন এবং তর্ককে একবারে বিসর্জন দিয়াছেন। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে ইহাঁরা রসতত্ত্বের অধিকার পাইয়াছেন। অদ্য আপনকার চরণে আসিয়া তদবিষয় বিস্তৃতরূপে শিক্ষা পাইবার আশা করেন।

পণ্ডিত বাবাজী রসতত্ত্বের নাম শুনিবামাত্র রসপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৈষ্ণববর্গের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গে গৌরাঙ্গ চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া তত্ত্বকথা আরম্ভ করিলেন।

" নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব্য সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভূবি-ভাবুকাঃ ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত কর্ত্তা কহিতেছেন সমস্ত নিগম শাস্ত্র কল্পতরু স্বরূপ সেই কল্পবৃক্ষের ফল শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। ফলটি পক্ক হইয়াছে। পক্ক ফল সমুদায় যেমত শুকপক্ষী কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়, ভাগবতরূপ পক্ক ফল শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক পৃথিবীতে আনিত হইয়াছে। অন্যান্য ফলের সহিত ইহার এই তারতম্য যে অপর ফলে খোসা ও আঁটি থাকে তাহা ইহাতে নাই, যেহেতু ইহা সম্পূর্ণ রস মাত্র। জড়াতীত ব্রহ্ম চিন্তায় বৈকুণ্ঠ তত্ত্বে লয় হয়। শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তায় লয় পর্য্যন্তই শেষ কিন্তু রসো বৈ সঃ ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরমরসময় শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় যে লয় ভাব উদিত হয়, তাহাই ভাবুক জীবনের প্রারম্ভ। অতএব হে ভাবুক সকল! বৈকুণ্ঠ ভাবরূপ লয় লাভ করিয়া রসতত্ত্ব সেবা পূর্বক এই ভাগবত শাস্ত্ররূপ রস ফলকে অনবরত পান করিতে থাক।

হে রসিক বৈষ্ণবগণ! রসই পরমার্থ। জগতে বিষয়ী লোক যাহাকে রস বলেন, আমরা তাহাকে রস বলি না। দেখুন আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যেমত বৃক্ষরসকে রস বলেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য বৃক্ষ রস হইতে কোন উৎকৃষ্ট মানসিক রসকে ব্যাখ্যা করেন, আমরাও তদ্রুপ জড়দেহ বা জড়ীয় মন সম্বন্ধের রসকে রস বলিব না, কিন্তু আত্মাতে যে রস স্বভাব দ্বারা অনুযন্ত্রিত আছে, তাহাকেই আমরা রস বলি। তুলনা স্থলে আমরা কখন খর্জুর বা ইক্ষু রস ও তজ্জাত গুড়, শর্করা মিচ্‌রি প্রভৃতির উল্লেখ করি; কখন বা প্রাকৃত নায়ক নায়িকা ঘটিত রস সকলকে বর্ণন করি, কিন্তু আমরা আত্মা সমূহ ও সমস্ত আত্মার আত্মা যে শ্রীকৃষ্ণ তন্মধ্যগত রসকেই একমাত্র বিষয় জানিয়া উদ্দেশ করি।

বিশুদ্ধ অবস্থায় মানবগণ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। সে অবস্থায় মন নাই। জড়ীয় শরীর নাই। যিনি মুক্তি অন্বেষণ করেন তিনি ঐ অবস্থাকে অন্বেষণ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। জীবসকল তদবস্থ হইয়া পরব্রহ্মের সহিত যে প্রকৃতির অতীত ধামে সহবাস করেন, সেই ধামের নাম বৈকুণ্ঠ। যে স্বরূপে জীবগণ তদবস্থ হন, সেই স্বরূপ প্রাকৃত দ্রব্যের অতীত বিশুদ্ধ চিন্ময়। সেই অবস্থায় জীবের যে ব্রহ্ম সহবাস রূপ অমিশ্র সুখভাব তাহাই রস।

জড়বদ্ধ হইয়া জীব নিজ বৈকুণ্ঠ স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। বৈকুণ্ঠ স্বরূপ বদ্ধাবস্থায় জড়সঙ্গ ক্রমে জড়ধর্মের গ্লানি সংযুক্ত হইয়া মনোরূপে পরিণত হইয়াছে।

তথাপি আত্মধর্মের বিচ্ছেদ হয় নাই। এখন জড়ীয় ভাবে আত্মার শ্রদ্ধা, আশা ও সুখ। স্বরূপের এরূপ অবস্থা হইলে, আত্মধর্ম যে রস তাহাও সুখ দুঃখরূপ বিষয় সম্ভোগাদি রূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিকার কাহাকে বলি? শুদ্ধ ধর্মের অপকৃতির নাম বিকার। বিকারেও সুতরাং শুদ্ধ ধর্ম অনুভূত হয়। বিষয় সম্ভোগাদি কার্য্যে যে রসের অনুভূতি হয় তাহাও আত্ম রসের অপকৃতি। আত্মাতে যে রস ছিল তাহা অল্প পরিমাণে আত্ম প্রত্যয় দ্বারা অনুভূত হয়। যদিও বিকৃত রসকে তাহা হইতে সহজ বুদ্ধিতে অনায়াসে ভিন্ন করিয়া লওয়া যায় তথাপি নামোচ্চারণ সময়েই ভিন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য আত্মগত রসকে ভক্তিরস বলা হইয়াছে। ভক্তি বৃত্তি ও বিষয় প্রেম বৃত্তি পরস্পর স্বাধীন তত্ত্ব নহে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিফলিত ভাবমাত্র। যুক্তিবাদীরা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মরসকে উপলব্ধি করত ভ্রমবশতই ভক্তি বৃত্তি ও বিষয় প্রেম বৃত্তিকে পৃথক তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা কিছুমাত্র ভক্তিরসের পরিচয় পাইয়াছেন এবং উভয় বৃত্তির স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর সেরূপ বিশ্বাস করে না।

পরব্রহ্ম রস অখন্ড হইলেও অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে বিচিত্র। ভাব ও রসের ভিন্নতা এই যে অনেকগুলি ভাব সমবেত হইলে রসোদয় হয়। ভাবুক ও রসিক শব্দেরও তদ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানিবেন। ভাব এক একটি ছবির ন্যায়। রস একখানি চিত্রপট স্বরূপ যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। যে কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদিত করে, সেইসকল ভাবগুলির বিবরণ না করিলে রস শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

ভাবসমষ্টি মিলিত হইয়া রসতা লাভ করে। সেই ভাব সকলের মধ্যে যে ভাব প্রধানরূপে কার্য্য করিতে থাকে তাহার নাম স্থায়ী ভাব। অপর তিনটি ভাবের মধ্যে একটির নাম বিভাব, একটির নাম অনুভাব এবং একটির নাম সঞ্চারী ভাব। স্থায়ী ভাবই অন্য ভাবত্রয়ের সাহায্যে স্বাদ্যত্ব লাভ করিয়া রস হইয়া পড়ে।

রসতত্ত্ব সমুদ্র বিশেষ। তাহার একবিন্দুর বিন্দুও আমি আস্বাদন করিতে পারি নাই। আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আপনাদিগকে রস বিষয়ে শিক্ষা দেই এমত আমার ক্ষমতা নাই। প্রভু গৌরাঙ্গদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই তোতা পক্ষীর ন্যায় আমি বলিতেছি।

আর এক প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা আমি রস তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রস তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ রস, স্বর্গীয় রস এবং পার্থিব রস। পার্থিব রস মিষ্টাদি

ষড়বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু খর্জুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাব নিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। বৈকুণ্ঠ রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হইবে। বদ্ধজীবে সে রস উদিত হইলেও আত্মা ব্যতীত আর কুত্রাপি স্থিতি নাই। আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। বৈকুণ্ঠ রসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক। এক বৈকুণ্ঠ রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস রসরূপে পরিণত। পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠ রসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুই প্রকার রস বৈকুণ্ঠ রসোদ্দেশ না হইলেও নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ প্রবৃত্তি পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব রসকে পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠ রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।

রস বলিলেই তাহাতে স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব রূপ ভাব চতুষ্টয় লক্ষিত হইবে। পার্থিব রসের উদাহরণ দেখুন। মিষ্টরসের আবির্ভাব কালে কয়টি ভাবের স্থিতি আছে। আদৌ মিষ্ট রসের প্রতি রতিই তাহাতে স্থায়ীভাব। সেই রতির পাত্রই তাহার বিভাব। পাত্র দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়। মিষ্টের প্রতি রতি যাহাতে আছে তাহাই অর্থাৎ মানব রসনাই সেই রতির আশ্রয়। সেই রতি যাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহাই অর্থাৎ গুড়ই তাহার বিষয়। বিষয়ে যে সকল প্রলোভন গুণ আছে সেই সকলই ঐ রতির উদ্দীপন। মিষ্টের প্রতি যখন রতির উদয় হয় তখন যে তাহার কিছু লক্ষণ প্রকাশ হয় সেই সমুদায়ই ঐ রতির অনুভাব। সেই রতি পুষ্টি করিবার জন্য আর যে যে হর্ষ ইত্যাদির ভাব হয় তাহাই সঞ্চারী ভাব। এই সমস্ত ভাবের সাহায্যে মিষ্ট রতি তখন স্বাদ্যত্ব লাভ করে তখনই মিষ্ট রস হয়।

স্বর্গীয় রসেরও উদাহরণ দেখুন। পার্থিব রস অপেক্ষা স্বর্গীয় রস অধিকতর বিস্তীর্ণ ও উদার, যেহেতু ইহাতে জড় অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। নায়ক নায়িকার রতিই দেখুন বা পিতা পুত্রের রতিই দেখুন বা প্রভু দাসের রতিই দেখুন অথবা সখাদিগের রতিই দেখুন সকল রতিতেই রতি স্থায়ীভাব থাকিয়া অন্যান্য ভাব ত্রয়ের সাহায্যে রস হইয়া উঠে।

যেমন পার্থিব রস হইতে স্বর্গীয় রস বিস্তীর্ণ ও উদার, তদ্রূপ স্বর্গীয় রস অপেক্ষা বৈকুণ্ঠ রস অনন্ত গুণে বিস্তীর্ণ ও উদার। পার্থিব রসে কেবল একটিমাত্র সম্বন্ধ

অর্থাৎ ভোগ্য ভোক্তৃ সম্বন্ধ। স্বর্গীয় রসে চারিটি সম্বন্ধ অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু স্বর্গীয় রসে, রসের অন্যায় গতি এবং অনুপযুক্ত বিষয়। তজ্জন্যই স্বর্গীয় রস নিত্য হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠ রসে সম্বন্ধ পাঁচটি অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। উভয় রসই আত্ম-সম্বন্ধী, পার্থিব সম্বন্ধী। এজন্য সম্বন্ধ ভাব উভয় রসেই একপ্রকার। কেবল উভয় রসের মধ্যে ভিন্নতা এই যে বৈকুণ্ঠ রসের সমস্ত উপকরণই নিত্য ও অখণ্ড পরব্রহ্ম ভাবিত। অতএব ঐ রসের নিত্য রসের স্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রসের সমস্ত উপকরণ অনিত্য অতএব ঐ রস সিদ্ধ নয়। সুতরাং অল্পকালস্থায়ী, লজ্জাঙ্কর ও তুচ্ছ ফলযুক্ত।

সাধারণতঃ ত্রিবিধ রসের সম্বন্ধ দেখাইলাম। এখন কেবল মাত্র বৈকুণ্ঠ রস সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারি তাহাই বলিব।

আমরা সময়ে সময়ে যুক্তিবাদীদিগের নিকট শুনিতে পাই যে বৈকুণ্ঠ রস বাস্তবিক নহে, কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে যুক্তি নাই; যেহেতু যুক্তি বৈকুণ্ঠতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। যিনি বৈকুণ্ঠ রসের আস্বাদন না করিয়াছেন তাঁহাকে সে তত্ত্ব কখনই বুঝাইতে পারিবেন না। অতএব যাঁহাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে তাঁহারা যুক্তিবাদকে এবম্বিধ বিষয়ে স্থান দিবেন না। সাধুসঙ্গে আস্বাদন করিয়া রসতত্ত্ব অনুভব করুন।

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। কল্য পুনরায় এ বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন পাইব। আপনারা বৈষ্ণব, অতএব এসব বিষয়ে সকলই জানেন। আমাকে অনুমতি করিয়াছেন বলিয়া আমি বলিতেছি।

বাবাজী নিস্তব্ধ হইলে সভা ভঙ্গ হইল। নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অবাক হইয়া শ্রুতবিষয় আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অষ্টম প্রভা সমাপ্ত
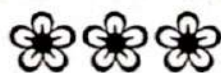
নবম প্রভা

যাহা পণ্ডিত বাবাজীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিতে করিতে নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর নিদ্রা হইল না। মল্লিক মহাশয় অন্য কুটীরে কুম্ভক অভ্যাস করিতেছিলেন, বাবাজী কৃপাপূর্বক তাহাঁকে তৎশিক্ষার সাহায্য প্রদান করিতেছিলেন। আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নরেন বাবু বলিলেন, আনন্দ বাবু! ব্রাহ্মাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে ভক্তি বৃত্তি বিষয়-প্রেমবৃত্তি হইতে একটি পৃথক্ বৃত্তি, তাহা আমি আর কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। পণ্ডিত বাবাজী যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহাই সম্পূর্ণরূপে মনে লাগে। বদ্ধ হইয়া মানবের যে একটি ভিন্ন বৃত্তি হইয়াছে এমত বোধ হয় না। আত্মার যে সাক্ষাৎ ধর্ম (যাহা মুক্ত অবস্থায় কার্য্য করে) তাহাই বদ্ধাবস্থায় মানস ধর্মরূপে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং আত্মগত অনুরাগই ঈশ্বরবহির্মুখতা লাভ করিয়া বিষয়ানুরাগ রূপে কার্য্য করিতেছে। সাংসারিক ব্যবহারে যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রস দেখিতেছি, সেই সম্বন্ধগত রসই বৈকুণ্ঠরসের বিকার এরূপ নিশ্চিন্ত হইতেছে। যাঁহারা স্বর্গীয়ভাবে সংসারে পুণ্যবানরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের চরিত্রকে সকলেই প্রশংসা করেন। যিনি দাস হইয়া অকৃত্রিম প্রভু ভক্তি প্রকাশ করেন, প্রভুর মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল এরূপ জানেন, যিনি সখা হইয়া সখার সুখে সুখী ও সখার দুঃখে দুঃখী হন, যিনি পুত্র হইয়া পিতৃসেবায় জীবন পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন এবং যিনি পত্নী হইয়া পতির সুখবৃদ্ধির জন্য মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন - সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলেই স্বর্গীয় আত্মা বলিয়া সম্মান করেন। অতএব সংসার সম্বন্ধ ঘটিত রসকে পণ্ডিত বাবাজী যে স্বর্গীয় রস বলিয়া উক্তি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত। আমরা অনেক সম্মানিক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে কোন স্ত্রী নিতান্ত পতিভক্ত হইয়া হৃদয়নাথের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাহাঁর চরিত্র পাঠ করিতে গেলে তাঁহার প্রতি কতদূর ভক্তির উদয় হয়। স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহ নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী ও অপর আত্মা পুরুষ এরূপ নিত্য ভাবে আছে এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তর

বা স্বর্গবাস স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থ লাভ হয় এরূপ বিশ্বাস করা যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব পণ্ডিত বাবাজী যে ঐ প্রেমকে অনিত্য বলিয়াছেন তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

বৈকুণ্ঠ প্রেম যে নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম জগতের সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উপাদেয় ইহা নিতান্ত দুর্ভাগাগণও স্বীকার করেন। কম্‌টী প্রভৃতি তার্কিকগনেও প্রেমকে সর্বানন্দ ধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষা যে মধুর প্রেম অধিক উচ্চতর তাহা ঐ প্রেমের স্বভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বৈকুণ্ঠ প্রেম বলিয়া কোন অতি চমৎকার প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে প্রেমের নিত্যতা হইত না। সেই প্রেমই আত্মস্বরূপ জীবের যে চরম উদ্দেশ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

আনন্দ বাবু, বাবাজী উপদিষ্ট বৈকুণ্ঠ প্রেমই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় প্রেম কখনই জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কেননা তাহার শেষ আছে। পার্থিব প্রেম ত নয়ই।

ব্রাহ্মাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে ভাব যদিও উৎকৃষ্ট তথাপি যুক্তির অনুগত হইয়া না থাকিলে ভাব কদর্য্য হইবে। দেখুন দেখি আচার্য্য মহাশয়ের কতদূর ভ্রম। ভক্তি যদি ভাবরূপিণী হয় তবে সে কেন অন্ধ ও খঞ্জ যুক্তির বশীভূত হইবে? ভাব বৈকুণ্ঠ প্রতি ধাবিত হইলে যুক্তি তাহাকে অবশ্য পার্থিব জগতে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। যুক্তিকে সে সময় রাখিতে গেলে কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন সম্ভব হইবে? আনন্দ বাবু! বৈকুণ্ঠ বিষয়ে যুক্তি, যুক্তি করিয়া নিরস্ত হয়। ব্রাহ্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে যখন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা যায় তখন বাৎসল্য ভক্তি আসে বটে; কিন্তু তাহার অন্তরে ভূমাপুরুষের প্রতি কোন অনির্বচনীয় ভাবোদয় হয় - যাহাকে ভক্তি বৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। আনন্দ বাবু! আচার্য্য এরূপ অন্ধ যুক্তি কেন ভালবাসেন বলিতে পারি না! পিতৃ ভক্তিরূপে বৃত্তিকেই কেন ভক্তি বৃত্তি বলি না? পার্থিব পিতায় নিযুক্ত হইলে ঐ বৃত্তি স্বর্গীয় রসগত বৃত্তি হয়। পরম পুরুষে নিয়োজিত হইলে উহা বৈকুণ্ঠরসের বাৎসল্য সম্বন্ধগত ভক্তি বৃত্তি হয় - ইহা বিশ্বাস করিলে সমস্তই চরিতার্থ হয়। আর ভূমাপুরুষ অর্থে ঐশ্বর্য্যময় ভগবানকে বুঝায়। সম্বন্ধ দৃঢ় করিলে ঐ ঐশ্বর্য্য অবশ্য লুক্কায়িত হইবে এবং মাধুর্য্যের উদয় হইবে। ফল কথা জীবের স্বভাব সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ রতি হইতে বাৎসল্য সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধগত বৃত্তি কৃষ্ণে প্রয়োজিত হয়। তাহা যখন আচার্য্য মহাশয় একটু বোধ করেন

তখন ঐশ্বর্য্য চিন্তা আসিয়া অন্য কোন অস্ফুট রসকে লক্ষ্য করায়। সে রসটি বাবাজী উপদিষ্ট বৈকুণ্ঠগত শান্তরস মাত্র। আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত পড়িয়া তাঁহাকে দুর্ভাগা বলিয়া বোধ হইতেছে। বাৎসল্য ও সখ্য রস অপেক্ষা যখন তাঁহার শান্ত রস ভাল লাগে তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠ তত্ত্বে উন্নতি কিরূপে হইবে তাহা বুঝিতে পারি না।

আনন্দ বাবু, যুক্তিবাদীরা যতই ঘৃণা করুক না কেন আমি বৈকুণ্ঠ রসগত শৃঙ্গার সম্বন্ধে মাধুর্য্যময় ভগবানকে উপাসনা করিতে স্পৃহা করি। আপনকার কি ভাব?

আনন্দ বাবু বলিলেন, নরেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা কহিনূর তুল্য মূল্যবান ও আদরণীয়; আমিও শৃঙ্গার রসের পিপাসায় পীড়িত হইতেছি।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। নিয়মিত রূপ কার্য্য সকলে দিবসও প্রায় যাপিত হইল।

দিবা অবসান সময়ে পূর্ব দিবসের ন্যায় সকলেই পণ্ডিত বাবাজীর মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস বাবাজী বিনীতভাবে পূর্ব রাত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পণ্ডিত বাবাজী কহিতে লাগিলেন ঃ-

প্রভু গৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া বৈকুণ্ঠ রসকে সম্পূর্ণরূপে জগতে শিক্ষা দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলেই বিস্তীর্ণরূপে রসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ সুদীর্ঘ হইলে মন্দপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে গ্রন্থ তাৎপর্যও সহসা সংগ্রহ করা কঠিন হয়। গ্রন্থের বাহুল্য প্রযুক্ত অনেকেই সংক্ষেপে ঐ তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন। ঐ তত্ত্বে সমস্ত বিষয় আনুপূর্বিক বর্ণন করিতে আমি সাহস করি না। অতি সংক্ষেপরূপে ঐ তত্ত্বের স্থূল বিষয়গুলি বলিতেছি। অপার রসসাগর বর্ণন করিতে আমার যে দম্ভ উদিত হয়, তাহা অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ অবশ্য ক্ষমা করিবেন। আমি বৈষ্ণবদাস, বৈষ্ণবগণের অনুমতি প্রতিপালনই আমার জীবনের প্রধান কার্য্য।

বৈকুণ্ঠ রস নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। উপনিষদগণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্বিশেষ বলিয়াছেন। সে সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জড় জগতে জলীয় পরমাণু বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ ধর্ম দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে সেরূপ জড়ীয় বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই এরূপ কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ ইহারা যুগবৎ সর্বত্র অবস্থান করে। যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যদ্দ্বারা সে বস্তু অন্য বস্তু

হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে সৃষ্ট বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন? যদি সৃষ্ট বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠকে ভিন্ন করিতে একটি বিশেষের প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠ অখণ্ড তত্ত্ব হইলে পারমেশ্বরী বিশেষ দ্বারা বিচিত্র। বৈকুণ্ঠ চিন্ময় - প্রকৃতির অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিলে বৈকুণ্ঠের আবরণ দেশকে বুঝায়, কেননা যেখানে জড়ীয় বিশেষ সমাপ্ত হইল সেখানে বৈকুণ্ঠ বিশেষের আরম্ভের পূর্বেই একটি বিশেষাভাব রূপ বিভাজক সীমা লক্ষিত হয়।

বৈকুণ্ঠে পরব্রহ্ম ওজীব নিচয় অবস্থিতি করেন। সেস্থলে বিশেষ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও জীবগণের চিন্ময় সিদ্ধ দেহ নিত্য ব্যবস্থিত। বিশেষই তথায় এক জীবকে অন্য জীবের সহিত এক হইতে দেয় না এবং জীব সমূহকে ভগবানে মিলিত করিয়া এক হইতে অবসর দেয় না। বিশেষ দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা, অবস্থান ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিশেষকে ভগবদতিরিক্ত পদার্থ বলা যায় না। বিশেষই ভগবৎ কৌশল রূপ সুদর্শন চক্র। উহাই ভগবচ্ছক্তির প্রথম বিক্রম।

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি, বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া, ভগবদ্বপু, জীব শরীর এতদুভয়ের অবস্থান ভাবরূপ চিন্ময় দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তির বিশেষ রূপ বিক্রম ত্রিবিধ। সন্ধিনী বিক্রম, সম্বিদ্বিক্রম ও হলাদিনী বিক্রম। সন্ধিনী বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা। শরীর সত্তা, শেষ সত্তা, কালসত্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণ সত্তা প্রভৃতি সমুদায় সত্তাই সন্ধিনী নির্মিত। সম্বিদ্বিক্রম হইতে সমস্ত সম্বন্ধ ও ভাব। হলাদিনী বিক্রম হইতে সমস্ত রস। সত্তা ও সম্বন্ধ ভাব সকলের শেষ প্রয়োজন রস। যাঁহারা বিশেষ মানেন না অর্থাৎ নির্বিশেষবাদী তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।

একটা কথা এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হউক। বৈকুণ্ঠ চিন্ময়, জীব চিন্ময়, ভগবান চিন্ময়, সম্বন্ধ চিন্ময়, তত্রস্থ কর্ম চিন্ময় এবং ফলসমূহ চিন্ময়। কি বুঝা গেল? ভূতময় জগত যেমত ভূত দ্বারা গঠিত; চিন্ময় ধামও তদ্রুপ চিদ্বস্তুর দ্বারা গঠিত। চিৎ কি? - ভূত বিশেষ, ভূত সূক্ষ্ম কি ভূত বিপর্য্যয়? তন্মধ্যে কিছুই নয়। চিৎভূতাদর্শ চিৎ যেমত পবিত্র ভূত তদ্রুপ অপবিত্র। হঠাৎ বলিতে গেলে চিৎকে জ্ঞানের সহিত তুলনা করা হয়। সেই বা কিরূপে হইতে পারে? আমাদের জ্ঞান ভূতমূলক, চিৎ কি

সেরূপ? - না। যদি পবিত্র জ্ঞান আত্মা হইতে সমাধি দ্বারা উপলব্ধ হয়, তবে চিগ্দত জ্ঞানের আস্বাদন হইতে পারে। চিৎ বলিতে কেবলই আত্মা বুঝায় এরূপ নয়। শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ অর্থাৎ কলেবর চিগ্দঠিত। চিন্নামক একটি গঠন সামগ্রী অচিন্ত্যশক্তি কর্তৃক নিত্য প্রকাশিত আছে। সেই দ্রব্যে স্থান, শরীর ও অন্যান্য উপকরণ বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আত্মা বৈকুণ্ঠস্থ তত্ত্ব, এই জন্য তাঁহার সহিত চিৎস্বরূপ জগতে আসিয়াছে। আসিয়া ভূত নামক দ্রব্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে। অতএব চিদ্বস্তুটি ভূত, ভূতসূক্ষ্ম, ভূততন্মাত্র ও ভূতবিপর্য্যয় যে নির্বিশেষ এ সমুদায় অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উপাদেয়। চিৎ ও চৈতন্য একই বস্তু। চৈতন্য শব্দ সম্বন্ধে একটু জানিতে হইবে। চৈতন্য দ্বিবিধ। প্রত্যগ্ চৈতন্য ও পরাগ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয় সে সময় যাহা উদয় হয় তাহাই প্রত্যগ্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান। যে সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয় তখন জড় জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাগ্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাগ্ চৈতন্যকে চিৎ বলি না, কিন্তু চিদাভাস বলি।

মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎ স্বরূপ। বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদচিচ্চিদাভাস স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেব্য। বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়। সেব্য রসই তদাকারে (কিন্তু বিকার সহকারে) আলোচনীয় হইয়াছে।

সমস্ত চিদ্বস্তুই শান্ত রসময়। সম্বন্ধ ভেদে রস পঞ্চবিধ। শান্ত রসই প্রথম রস। ইহাতে ভগবচ্চরণে বিশ্রাম, মায়িক যাতনার উপরতি, ভগবান ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না - এই কয়েকটি ভাব আছে। ব্রহ্মবাদরূপ শুষ্ক নির্বিশেষবাদ সমাপ্ত হইলেই ঐ রসের উদয় হয়। সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, পরে ভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করিয়া শান্ত রসে মগ্ন হন। শান্তরসেও অপ্রস্ফুটরূপে স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব লক্ষিত হইবে। শান্তরসে স্থায়ী ভাবটি চিরকালই রতি স্বরূপে অবস্থিতি করে। পুষ্ট হইয়া প্রেম স্বরূপ হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে রস বৃদ্ধি হইলে রসের দ্বিতীয় অবস্থা যে দাস্য রস তাহাই উদিত হয়। ইহাতে মমতারূপ একটি সম্বন্ধস্থ গূঢ় ভাব আসিয়া সম্বন্ধভাবকে পুষ্ট করে। স্থায়ীভাব যে রতি তিনি ঐ রসে প্রেমরূপে পুষ্ট হন। তখন ভগবান জীবের একমাত্র প্রভূ এবং জীব ভগবানের একমাত্র দাস হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

সখ্যই তৃতীয় রস। ইহাতে স্থায়ীভাব যে রতি তিনি প্রেম অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া প্রণয়তা লাভ করত রস হইয়া পড়েন। এই রসে প্রভু দাসগত সম্ভ্রম দূর হয় ও বিশ্বাস বলবান হইয়া উঠে।

চতুর্থ রস বাৎসল্য। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় অতিক্রম করিয়া স্নেহতা, প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিশ্বাস সমৃদ্ধ হইয়া বল হইয়া পড়ে।

মধুর রসই পঞ্চম রস। ইহাতে স্থায়ী ভাব যে রতি তিনি প্রেম, প্রণয়, স্নেহ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মান, ভাব, রাগ মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হন। ইহাতে বল এতদূর বৃদ্ধি হয়, যে পরস্পর এক চিত্ত এক প্রাণ হইয়া পড়ে।

এই পঞ্চধিক রসই বৈকুণ্ঠে আছে। বৈকুণ্ঠের বহিঃ প্রকোষ্ঠ ঐশ্বর্য্যময়। অন্তঃপুর মাধুর্য্যময়। ঐশ্বর্য্যময় অংশে ভগবান নারায়ণ চন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠ দ্বিভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ গোলক ও বৃন্দাবন।

শান্ত, দাস্য, এই দুইটি রস ঐশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠে সর্বদা মূর্ত্তিমান। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে নিত্য বিরাজমান।

যে জীবের যে রসে প্রবৃত্তি তাহার তাহাতেই বিশ্রাম ও আনন্দ।

নবম প্রভা সমাপ্ত
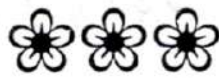
দশম প্রভা

স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব - এই ভাব চতুষ্টয়ের যোজনা না হইলে রসের উদয় হয় না।

আদৌ স্থায়ী ভাবের বিচার করা কর্ত্তব্য। রসোদ্দীপন কার্য্যে যে ভাব মুখ্যরূপে কার্য্য করে তাহাকে স্থায়ী ভাব বলি। রতিই স্থায়ী ভাব, যেহেতু রতিই স্বাদ্যত্ব লাভ করিলে রস হয়। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব, ইহারা সাহায্য করিয়া রতিকে রস করিয়া তুলে। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব - উহারা কখনই স্বয়ং রস হয় না। রসোদ্দীপনের কারণই বিভাব। রসোদ্দীপনের কার্য্যই অনুভাব। রসোদ্দীপনের সহকারী সঞ্চারী ভাব। অতএব রতিই রসমূল, বিভাব রসহেতু, অনুভাব রসকার্য্য এবং সঞ্চারী ভাব রসের সহকারী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর - এই পঞ্চবিধ

রসের সকল প্রকার রসেই এই কয়েকটি অবস্থার ঐক্য আছে।

রতি কি? উত্তর, - স্থায়ী ভাব। কিছুই বুঝা গেল না! লিপ্সা ও উল্লাসময়ী আনুকূল্যাত্মিক ভক্তির নাম রতি। আত্মার প্রথম ক্রিয়াই রতি। আত্মা জ্ঞানময়, অতএব জ্ঞপ্তিই তাহার কার্য্য। ভক্তি দ্বিবিধ, চিন্তামযী ভক্তি ও রসময়ী ভক্তি। চিন্তাময়ী ভক্তি পুষ্ট হইলে জ্ঞানাঙ্গের সমুদায় ব্যাপার উদ্ভুত হয়। রসময়ী ভক্তির ব্যক্তি হইলে রতি হয়। রতির লক্ষণ এই যে উহা আনুকূল্যাত্মিকা, অর্থাৎ ইষ্টসাধিনী ভাবময়ী,--উল্লাসময়ী অর্থাৎ ইষ্ট সম্বন্ধে আগ্রহময়ী, - লিপ্সাময়ী অর্থাৎ ইষ্ট বাসনাময়ী। রসের প্রতি আত্মার চেষ্টার প্রথম অঙ্কুরকে রতি বলা যায়। কেহ কেহ রুচিকে তচ্চেষ্টার অঙ্কুর বলেন, তাহাতে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না, কেননা আত্মার জ্ঞানচেষ্টা ও রসচেষ্টা এতদুভয় চেষ্টার অঙ্কুরকে রুচি বলা যায়। শুদ্ধ রসচেষ্টার অঙ্কুরের নাম রতি। শুদ্ধ জ্ঞানচেষ্টার অঙ্কুরের নাম বেদনা। অন্যান্য ভাবগুলি রতিকে আশ্রয় করিয়া রসোদ্দীপন কার্য্যে অবস্থিতি করিতে পারে বলিয়া রতির নাম স্থায়ীভাব। বৈকুণ্ঠ রসে আত্মরতিই স্থায়ী ভাব। স্বর্গীয় রসে চিত্ত রতিই স্থায়ীভাব। সামান্য আলঙ্কারিকেরা রতিকে তজ্জন্যই চিত্তোল্লাসময়ী বলিয়াছেন। পার্থিব রসে ইন্দ্রিয়োল্লাসময়ী রতিকে স্থায়ী ভাব বলিতে পারা যায়।

শান্ত দাস্যাদি পঞ্চ সম্বন্ধের কোন সম্বন্ধ ভাবসংলগ্ন হইবামাত্র গুপ্ত রতির ব্যক্তি হয় ক্রমশঃ দীপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রতি, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব হইয়া উঠে। রতির পুষ্টির সহিত উদ্দিষ্ট রসের পুষ্টি হয়।

বিভাব দুই প্রকার - আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে - আশ্রয় ও বিষয়। যাহাতে রতি আছে তাহাতে আশ্রয় বলি। যাহার প্রতি রতির চেষ্টা তাহাকে বিষয় বলি। মূলতত্ত্ব এক হইলেও উদাহরণ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রসে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। ঐশ্বর্য্যগত রসে নারায়ণের উদাহরণ। মাধুর্য্যগত রসে শ্রীকৃষ্ণই উদাহৃত হন। আমরা শৃঙ্গাররস অবলম্বন পূর্বক উদাহরণ দিব। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্ত ইহাঁরা আলম্বন। ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের যে রতি তাহার আশ্রয় কৃষ্ণ ও বিষয় ভক্ত। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে রতি তাহার বিষয় কৃষ্ণ ও আশ্রয় ভক্ত।

আশ্রয় ও বিষয়ের যে সমস্ত গুণগণ আছে তাহাই উদ্দীপন। বিষয়ের যে গুণে রতি আকৃষ্ট হয় তাহাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যগর্ভ গুণগণ অনন্ত ও অপার। জীবাত্মা সেই গুণগণে মোহিত হইয়া থাকে। জীব রতির উদ্দীপন সেই সমস্ত গুণকে বলিতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র ও ভক্ত জীবের আনুরক্তি প্রভৃতি গুণগণে আকৃষ্ট হন।

সেই সমস্ত গুণই কৃষ্ণ রতির উদ্দীপন। রতির ব্যক্তিকারী সম্বন্ধভাব বিভাবের অনুগত।

শৃঙ্গার রসে কৃষ্ণ পুরুষ, - সকল ভক্তই স্ত্রী। কৃষ্ণ পতি এবং ভক্তসমূহ তদীয় পত্নীগণ। স্বকীয় পারকীয় সম্বন্ধে ইহাতে যে একটি গূঢ় তত্ত্ব আছে তাহা গূঢ়ভাবে শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণে শিক্ষা করিতে হয়। এরূপ সভায় আমি তাহা ব্যক্ত করিলে অনধিকারীর পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইতে পারে। উচ্চস্থিত সত্যসমূহ উচ্চপদস্থ না হইলে লভ্য হয় না। যেমত সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে ক্রমশঃ উচ্চজ্ঞানের উদয় হয়, তদ্রুপ ভক্তি শাস্ত্রেও উচ্চাধিকারক্রমে গূঢ় তত্ত্বের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি শান্ত ভক্ত তিনি পরমেশ্বরকে সখা বলিতে কম্পিত হন। যিনি বাৎসল্য ভক্ত তিনি তাঁহাকে পতি বলিতে কুণ্ঠিত হন। যিনি স্বকীয় কান্ত ভাবের সেবক তিনি মানাদিগত বাম্যভাব বিস্তার করিতে নিতান্ত অপারক। ভক্তের অধিকারক্রমে কৃষ্ণ যে কতদূর অধীনতা ভাব স্বীকার করেন তাহা শ্রীজয়দেবাদি পরম রসিকগণই অবগত আছেন। আপনারাও রসিক ভক্ত, অতএব আমি সে বিষয় আর অধিক বলিব না। রসতত্ত্বের মূলকথা ব্যতীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদাহরণে আমি প্রবেশ করিব না। আমি বিভাব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিব যে কৃষ্ণ পতি এবং উপপতি ভাবে আলম্বন হন এবং ভক্ত স্বকীয়া, পারকীয়া ও সাধারণী ভাবে ত্রিবিধ। শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সে সমুদায় তত্ত্ব বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবেন।

অনুভাব আদৌ দুই প্রকার অর্থাৎ আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক। কেহ কেহ সাত্ত্বিক অনুভাবকে স্বাধীন অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করেন। ফলতঃ তত্ত্ব একই প্রকার।

আঙ্গিক অনুভাব ত্রিবিধ ঃ-

১) অলঙ্কার। ২) উদ্ভাস্বর। ৩) বাচিক।

অলঙ্কার ত্রিবিধ অর্থাৎ ১। অঙ্গজ, ২। অযত্নজ, ৩। স্বভাবজ।

অঙ্গজ অনুভাব তিন প্রকার ঃ-

১) ভাব। ২) হাব। ৩) হেলা।

অযত্নজ অনুভাব সপ্ত প্রকার ঃ-

১) শোভা। ২) কান্তি। ৩) দীপ্তি। ৪) মাধুর্য্য।

৫) প্রগল্‌ভতা। ৬) ঔদার্য্য। ৭) ধৈর্য্য।

স্বভাবজ অনুভাব দশ প্রকার ঃ-

১) লীলা। ২) বিলাস। ৩) বিচ্চিত্তি। ৪) বিভ্রম।

৫) কিলকিঞ্চিত। ৬) মোট্টায়িত। ৭) কুট্টমিত। ৮) বির্বোক।

৯) ললিত। ১০) বিকৃত।

এই কয় প্রকার আলঙ্কারিক অনুভাব দর্শিত হইল।

উদ্ভাস্বর পঞ্চ প্রকার ঃ-

১) বেশ ভূষার শৈথিল্য। ২) গাত্র মোটন। ৩) জৃম্ভা।
৪) ঘ্রাণের ফল্লত্ব। ৫) নিশ্বাস প্রশ্বাস।

বাচিক অনুভাব দ্বাদশ প্রকার ঃ-

১) আলাপ। ২) বিলাপ। ৩) সংলাপ। ৪) প্রলাপ।

৫) অনুলাপ। ৬) উপলাপ। ৭) সন্দেশ। ৮) অতিদেশ।

৯) অপদেশ। ১০) উপদেশ। ১১) নির্দেশ। ১২) ব্যপদেশ।

এই সমস্ত আঙ্গিক অনুভাব কথিত হইল। সাত্বিক অনুভাব অষ্টবিধ।

১) স্তম্ভ। ২) স্বেদ। ৩) রোমাঞ্চ। ৪) স্বরভঙ্গ।

৫) বেপথু। ৬) বৈবর্ণ। ৭) অশ্রু। ৮) প্রলয়।

অঙ্গ ও সত্বেতে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে তাহা বিচার করিয়া না বুঝিলে পূর্বোক্ত বিভাগটিকে কখনই ভাল বোধ হইবে না। সমস্ত অঙ্গের অধিষ্ঠাতা চিত্ত। চিত্তের বিকৃতিকে সত্ত্ব বলি। তাহাতে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা অঙ্গে ব্যাপ্ত হইলেও

তজ্জন্মস্থান বিচার পূর্বক ঐ সকল ভাবকে সাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। পরন্তু আঙ্গিক ভাব সকল প্রতি অঙ্গে উদিত হইয়া দীপ্ত হয়। সাত্ত্বিক বিকার সকল সত্ত্বে উদিত হয়। আঙ্গিক বিকার সকল অঙ্গগত ভাবে উদিত হয়। বিভাগটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বুঝিতে কাল বিলম্ব হয়।

রস সম্বন্ধে স্থায়ীভাব ও বিভাব যেমত দুইটি প্রধান পর্ব, তদ্রূপ অনুভাবকেও একটি প্রধান পর্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমত অনুভাব একটি পর্ব তদ্রূপ সঞ্চারী ভাবগুলিও একটি পর্ব। তাহারা তেত্রিশটি ঃ-

১) নির্বেদ।	২) বিষাদ।	৩) দৈন্য।	৪) গ্লানি।
৫) ভ্রম।	৬) মদ।	৭) গর্ব।	৮) শঙ্কা।
৯) আবেগ।	১০) উন্মাদ।	১১) অপস্মার।	১২) ব্যাধি।
১৩) মোহ।	১৪) মৃতি।	১৫) আলস্য।	১৬) জাড্য।
১৭) ব্রীড়া।	১৮) অবহিত্থা।	১৯) স্মৃতি।	২০) বিতর্ক।
২১) চিন্তা।	২২) মতি।	২৩) ধৃতি।	২৪) হর্ষ।
২৫) ঔৎসুক্য।	২৬) ঔগ্র্য।	২৭) আমর্ষ।	২৮) অসূয়া।
২৯) চাপল।	৩০) নিদ্রা।	৩১) সুপ্তি।	৩২) প্রবোধ।
৩৩) দশা।			

এই সঞ্চারী ভাবগুলিকে ব্যভিচারী ভাবও বলা যায়। স্থায়ী ভাব যে রতি তাহাকে ঐ সকল ভাবে পুষ্ট করে। স্থায়ীভাবকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে সঞ্চারী ভাবগুলিকে ঊর্মির সহিত তুলনা করা যায়। ঊর্মি সকল যে রূপ সময়ে সময়ে বেগে উঠিয়া পরে সমুদ্রকে স্ফীত করে, তদ্রূপ সঞ্চারীভাব সকল রস সাধকের রতি সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন ক্রমে রসকে স্ফীত করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের প্রতি ধাবিত হওয়ায় ইহাদিগকে বাভিচারীভাব বলিয়া থাকেন।

সঞ্চারী ভাব সকল চিত্তস্থ ভাব বিশেষ। চিত্তে যে তেত্রিশটি ভাব স্বভাবতঃ উদিত থাকে, সেই সকল ভাবই শৃঙ্গার রসে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উদিত হইলেই শৃঙ্গার রসের সঞ্চারী ভাব হয়। ঐ ভাব সকল বিপরীত ভাবাপন্ন। সকল ভাবই এক সময়ে কার্য্য করে এরূপ নয়। যখন যে প্রকার রসকার্য্য হইতেছে তদনুযায়ী সঞ্চারী

ভাবের উদয় হয়। কখন নির্বেদ কখন বা মদ। কখন আলস্য কখন প্রবোধ। কখন বিষাদ কখন বা হর্ষ। কখন মোহ কখন বা মতি। এই প্রকার সঞ্চারী ভাবের উদয় না হইলে রতি কিরূপে পুষ্ট হইবে।

এখন বুঝিয়া দেখুন স্থায়ীভাব রূপ রতিই নায়ক স্বরূপ। সম্বন্ধাত্মক বিভাবই তাহার সিংহাসন। কার্য্যরূপ অনুভাবই তাহার বিক্রম। সঞ্চারী ভাব সকলই তাহার সৈন্য। রসের যে পঞ্চ প্রকার ভেদ তাহা কেবল সম্বন্ধ ভেদক্রমে স্ফুট হয়। রতিই রসতত্ত্বের অবিভাজ্য মূল স্বরূপ। রতি একা থাকিলেই রতি। সম্বন্ধ যোজিত হইলেই প্রেম। রতি সম্বন্ধাশ্রয় প্রাপ্ত হইবার সময় যে প্রকার বিভাবকে লাভ করে, তদ্রূপ সম্বন্ধ যোগে তদনুযায়ী রসাশ্রিত প্রেমরূপে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। সেই রসের যত উন্নতি হয় ততই সাধক অন্য রস হইতে দূরে পড়িতে থাকেন। যে রসে যাহার উন্নতি সেই রসই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ। ইহাই রস তত্ত্বের স্বরূপ বিচার। তটস্থ বিচারে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ এবং বাৎসল্য রস হইতে মধুর রস শ্রেষ্ঠ, তটস্থ বিচারে এইরূপ তারতম্য দেখা যায়। শান্ত রসে রতি একা অবস্থিতি করে। তাহাতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব অপ্রস্ফুট। সেস্থলে সাধক মায়া পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মগত হইয়া নির্বিশেষ প্রায় অদৃষ্ট জড়ের ন্যায় লক্ষিত হন। ইহা যদিও মুক্তি বিশেষ বটে, কিন্তু মুক্তির ফল নয়। অলক্ষিত রতি আকাশ কুসুমের ন্যায় অকর্মণ্য। উচ্চতর সাধকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম সাধকেরা তাহার যতই প্রশংসা করুন না কেন, বৈষ্ণবগণ ঐ অবস্থাকে গর্ভস্থ বলিয়া জানেন।

বিভাব সংযোজিত হইবামাত্র দাস্য রসের উদয় হইবে। দাস্যই দুই প্রকার অর্থাৎ সিদ্ধ দাস্য ও উন্নতিগর্ভ দাস্য। সিদ্ধ দাস্য, দাস্য রসই বেধী। উন্নতিগর্ভ দাস্যে, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসে অঙ্কুর আছে।

সখ্যও তদ্রূপ দ্বিবিধ। সিদ্ধ সখ্য ও উন্নতিগর্ভ সখ্য। সিদ্ধ সখ্যে রতি, প্রেম ও প্রণয় অচলরূপে লক্ষিত হয়। উন্নতিগর্ভ সখ্যে বাৎসল্য বা কান্তভাবের অঙ্কুর আছে।

বাৎসল্য সর্বত্রই সিদ্ধ। বাৎসল্য রসান্তরে পর্য্যবসিত হয় না। সখ্য পুষ্ট হইলে হয় বাৎসল্য, নয় মধুর রস হইবে। বাৎসল্য একপ্রকার চরম হইলেও মধুর রসাপেক্ষা ন্যূন। মধুর রসে প্রণয়, মান ও স্নেহ ইত্যাদির ইয়ত্তা নাই। উহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

হে বৈষ্ণব মহোদয়গণ! রসতত্ত্ব আমি সংক্ষেপে বলিলাম। কেবল বাক্য বিবৃতির

দ্বারা এ সম্বন্ধে অধিক বলা যায় না। রস আস্বাদনের বিষয়। রসকে কেহ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারে না। আপনারা যে কালে ঐ পবিত্র রসের আস্বাদন করেন, তখন যে সকল অনুভূতির উদয় হয়, তাহা আপনারা জানেন, কখনই বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না। যদি আমাদের মধ্যে কেহ রসতত্ত্বের আস্বাদন না করিয়া থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে উপযুক্ত গুরুদেবের আশ্রয় লইয়া রসের আস্বাদন করতঃ তত্ত্বের অনুভব করেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না বৈষ্ণব চরণে অশেষ প্রণতিপূর্বক আমি বিরাম গ্রহণ করিলাম।

বৈষ্ণবগণ পণ্ডিত বাবাজীর অমৃতময় বাক্যে প্রীত হইয়া, সাধু সাধু ধ্বনি করত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু বাবাজী মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করত নিতান্ত রস পিপাসু হইয়া রস শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য যোগী বাবাজীর চরণাশ্রয় করিলেন। তাঁহারা শ্রীগুরুচরণ হইতে যাহা লাভ করিলেন, তাহা অত্যন্ত রহস্য বলিয়া আর প্রকাশিত হইবে না। মল্লিক মহাশয়ের প্রাক্তন ফলক্রমে যোগ শাস্ত্রেই বিশেষ ক্ষমতা জন্মিল। কিন্তু রস তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দশম প্রভা সমাপ্ত

প্রেম প্রদীপ সম্পূর্ণ

❀❀❀